সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া আপন প্রিয়তমার সহিত অতি উচ্চৈস্বরে কথা কহিতে কহিতে বিচার স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

শম্ভু কয়েদি জেলখানা হইতে পলাইয়াছিল বলিয়া গুরুতর অপরাধী হইয়াছে, তাহাকে বিশেষ দণ্ড দিবার আবশ্যক, এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মেজেষ্টর সাহেব লিখিতে লিখিতে মাথা তুলিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন শম্ভু কয়েদি সেখানে নাই। শম্ভু কয়েদি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না। প্রহরিগণ চারি দিকে ধাবিত হইল কিন্তু কেহ তাহার সাক্ষাৎ পাইল না। মেজেষ্টর সাহেব রাগান্বিত হইয়া অনেককে তিরস্কার করিলেন, অনেককে পদচ্যুত করিলেন। শেষে যে শম্ভু কয়েদিকে ধরিয়া আনিতে পারিবে বা তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে একসহস্র টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, এমত ঘোষণা দিবার অনুমতি করিয়া উঠিয়া গেলেন।

দর্শকেরা শম্ভু কয়েদির কথা কহিতে কহিতে স্বস্ব গৃহে গেল। বিচার স্থানে শম্ভু কোন সাহসে আসিল এবং কি রূপেই বা অদৃশ্য হইল এই কথাই সকলে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিতে করিতে গেল। ডাকাতের সাহস আর ডাকাতের কৌশল অসীম এই বলিয়া অনেকে আপন আপন কৌতূহল নিবারণ করিয়া গৃহে গেলেন। কেহ কেহ গৃহিণীর নিকট শম্ভুর পরিচয় দিতে দিতে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার শূর বংশ।

বিক্রমপুর অঞ্চলের কোন বিশেষ পণ্ডিত শূরবংশীয় রাজাদিগের নামাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। নাম গুলি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম কিন্তু কোন্ গ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যিনি এই নামগুলি লিখিয়া গিয়াছেন অনেক দিন হইল তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে; তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, বিক্রমপুর অঞ্চলে ঘটকদিগের মধ্যে এক্ষণে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সেই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এই নামাবলীতে রাজাদিগের যে পরিচয় স্থানে স্থানে আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে নিশ্চয় ঘটকদিগের গ্রন্থ হইতে এই নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

১। কবি শূর।
২। মাধব শূর।
৩। আদিশূর।
৪। ভূ শূর।
৫। দ্বিজ শূর।
৬। ক্ষিত শূর।
৭। প্রভা শূর।
৮। সুরা শূর।
৯। অনু শূর।
১০। হেমন্ত সেন।

জয় সেন।

১২। বল্লাল সেন।

অনুশূরের পর বল্লাল সেনের পিতামহ হেমন্ত সেন রাজা হয়েন। পণ্ডিতবর লিখিয়া গিয়াছেন, অনুশূরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহই ছিল না। বল্লাল সেন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, রাজ্য তাঁহার হস্তেই ছিল অতএব মন্ত্রীর আসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। শূর বংশ হইতে কি প্রকারে রাজ্য সেন বংশে সমর্পিত হইল তাহা এপর্য্যন্ত জানা ছিল না। কিন্তু যে কারণ লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, সত্য হইলেও হইতে পারে।

এই নামাবলীতে আর গুটিকত কথা লিখিত আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বল্লাল সেন কুলীনের সৃষ্টি করেন কিন্তু পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে ভূ শূর প্রথমে কুলীনের পদ সৃষ্টি করেন, বল্লাল সেন সেই কুলীন বংশীয় দিগের আট জনকে মুখ্য করেন। ৮০৩ বৎসর হইল, ৯০৪ শকে আদিশূর রাজা পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ১৪৯৯ শকে দেবীবর ঘটক তাঁহাদের সন্তান দিগের যেল বদ্ধ করেন।

ভ্রমর

মাসিক পত্র।

২য় খণ্ড।] বৈশাখ ১২৮২। [১ সংখ্যা।

ভ্রমরের আত্মকথা।

ভ্রমরের বয়ঃক্রম একবৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই অল্পকাল মধ্যে ভ্রমর যেরূপ আদরিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রত্যাশা করি নাই। ভ্রমর অতি নম্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; জন্ম-বার্ত্তা কোন সংবাদ পত্রে পাঠান হয় নাই, কুলা বাজাইতে কাহাকেও ডাকা যায় নাই; অথচ বাঙ্গালার পদ্মমাত্রেই ভ্রমরের বার্ত্তা পাইয়াছেন। এক্ষণে যেখানে পদ্ম সেই খানেই ভ্রমর। যে গৃহে ভ্রমর যায় না আমরা শুনিয়াছি সে গৃহে পদ্ম নাই কেবল শিমুল শর্ম্মারা বাস করেন।

অল্পকালমধ্যে ভ্রমর চট্টগ্রাম হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হইবে ভ্রমর নিতান্ত তুর্ব্বল নহে।

ভ্রমরের গ্রাহক অনেক বাড়িয়াছে, নিত্য বাড়িতেছে; কিন্তু ভ্রমরের কলেবর বাড়িল না কেন, এই কথা জনেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা প্রত্যুত্তরে বলি, বয়স বাড়িলে কলেবর বাড়িবে।

জনেক সূক্ষ্মদর্শী বলিয়াছেন যে, ভ্রমর দুই একটি বড় কথা ছোট করিয়া বলিতে পারিয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ছোটকথা বড় করিয়া বলিতে পারে নাই। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভ্রমর বিশেষ আহ্লাদিত; ছোটকথা বড় করা আমাদের আধুনিক প্রথা—অপ্রতুলতার ফল। শূন্য পাত্রের শব্দ অধিক।

ভ্রমরের ত্রুটি অনেক। কিন্তু সেই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও যদি ভ্রমর কখন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পাঠকদিগকে সুখী করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে ভ্রমর আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিবে; পাঠকদিগের সুখসাধন করা ভ্রমরের প্রধান অভিলাষ।

সুখসাধনের সঙ্গে হিতসাধন করা ভ্রমরের আর একটি অভিলাষ। পুরাকালিক পুরোহিতের ন্যায় ভ্রমর গ্রাহকদিগের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। হিতসাধন করিতে না পারে হিতাকাঙ্ক্ষী চিরকাল থাকিবে।

বঙ্গে পাঠক সংখ্যা।

বাঙ্গালায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু পুরুষ বাস করিতেছেন তন্মধ্যে ন্যূনাতিরেক তিন লক্ষ ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে সক্ষম। যে দেশে এত লোক পড়িতে পারে সে দেশের ভাবনা কি? তুমি আপন শয়ন ঘরে বসিয়া সমাজ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত কথা লিখিলে; তিন লক্ষ লোক তাহা পড়িল, তোমার সহিত একমত হইল। তিন লক্ষ লোক একমত! একথা শুনিলে সমুদ্রেরও ভয় হয়। সমুদ্রেরও বন্ধন ভয় আছে; একমত হইলে কাঠবিড়ালীরাও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

বাঙ্গালায় তিন লক্ষ লোক পড়িতে পারে; বাঙ্গালার ভাবনা কি? যে স্থলে তিন লক্ষ পাঠক কিন্তু সেস্থলে পঞ্জিকা ভিন্ন কোন গ্রন্থের তিন হাজার মুদ্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায় না। সংবাদ বা সাময়িক পত্রের গ্রাহক দুই হাজারের অধিক নাই; প্রত্যেক গ্রাহক দিগের আত্মীয় মধ্যে যদি চারি জন করিয়া পাঠক অনুভব করা যায়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশ হাজার পাঠক হইবে। ইহার কারণ কি?

কতকগুলি লোক অল্প ইংরাজি পড়িয়াছেন বাঙ্গালা পড়িতে তাঁহাদের অপমান বোধ হয়। কতক গুলি লোকের ইংরাজিতে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ইংরাজি মহাজন কৃত গ্রন্থের রসাস্বাদনে সক্ষম; সে সকল গ্রন্থ থাকিতে বাঙ্গালার আধুনিক অসার গ্রন্থ দ্বারা তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয় না।

আর কতক গুলি লোক আছেন তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনে বা অন্য বিষয়ে এত একাগ্র যে কোন গ্রন্থই তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অনেক রসে তাঁহারা বঞ্চিত।

অবশিষ্ট অধিকাংশ লোকই পাঠ্য গ্রন্থ পাইলেই পড়িতে পারেন। পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, সময়ও আছে, কিন্তু পাঠ্য কিছুই তাঁহাদের হস্তগত হয় না। তাঁহারা যে সকল পল্লীগ্রামে বাস করেন তথায় গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। অন্যত্র হইতে যে তাহা আনিয়া পড়িবেন এতটা উদ্যোগ তাঁহাদের নাই। গ্রন্থ অনায়াসে প্রাপ্য হইলে তাঁহারা পড়িতে পারেন। যদি গ্রামে গ্রামে পাঠ্য পুস্তক অল্প মূল্যে পাওয়া যায় তাহা হইলেই বাঙ্গালার নূতন দিন উপস্থিত হইবে। একতার পথ পরিষ্কৃত হইবে। বাঙ্গালির নাম সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইবে।

বটতলার চরদিগকে স্থানে স্থানে বটতলার গ্রন্থ লইয়া যাইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেখানেই তাহারা

গিয়াছে সেই খানেই তাহারা মনসার ভাষাণ, সত্যনারায়ণের কথা, কি মজার শনিবার, হায়রে সকের জলপান প্রভৃতি অপাঠ্য পুস্তক পড়াইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালি যেরূপ কাঙ্গালি পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও সেইরূপ। পড়িবার স্পৃহা আছে কিন্তু পড়িতে পায় না। বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দিগের পক্ষে এই এক সময়। এই সময় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে অদ্ভুত মঙ্গল সাধন হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালার তিন লক্ষ লোককে পড়াইতে পারিবেন তাঁহারাই বাঙ্গালার মহাজন।

অতএব সকলে চেষ্টা করুন, এবিষয়ে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না, যতটুকু চেষ্টা করা যাইবে ততটুকু সফল হইবে; চেষ্টা দ্বারা একজনকে পড়াইতে পারিলেও সফল গণিব। বটতলার দলকে যতই উপহাস করি তাহারা এবিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। তাহারা অক্ষয় হউক, তাহাদের দল নিত্য বৃদ্ধি হউক, তাহারা বাঙ্গালার সমুদয় গ্রামে গতিবিধি করুক। ক্ষুদ্র পাঠ্য পুস্তক অপ্রাপ্য বলিয়াই তাহারা এক্ষণে অপাঠ্য পুস্তক পাঠায়, পরে সে দোষ থাকিবে না।

নূতন পঞ্জিকা একলক্ষ করিয়া ইদানীং বিক্রয় হয়। এই বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে উপরোক্ত কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। বটতলার যত্নে এই সংখ্যক পঞ্জিকা বিক্রয় হইতেছে। সে যত্ন স্বার্থপরতাজনিত হউক, আর যাহাই হউক, সামান্য নহে। যে স্থলে এক লক্ষ পঞ্জিকা বিক্রয় হয়, সে স্থলে পাঠক সংখ্যা যাহা অনুভব করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, তিন লক্ষের বরং অধিক হইবে। এই পাঠকদের নিমিত্ত পঞ্জিকা এক লক্ষ বিক্রয় হয়, কিন্তু অন্য পুস্তক এক হাজার বিক্রয় হয় না। পঞ্জিকার ন্যায় অন্য পুস্তক প্রয়োজনীয় না হইতে পারে,

কিন্তু সুখদ হইবার সম্ভাবনা। কেবল সুখদ হইলে কি হইবে, সুখদ গ্রন্থ দুর্ম্মূল্য, কাজেই বটতলার চক্ষুঃশূল।

ক্ষুদ্র গ্রন্থ যেখানে যাইবে কালে তথায় বড় গ্রন্থ পথ পাইবে। ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র যেখানে পঠিত হইবে কালে তথায় বড় বড় সংবাদ পত্র পঠিত হইবে। অতএব গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্র লেখক মাত্রেরই এবিষয়ে মনোযোগ করা উচিত; এবিষয়ে তাঁহারা সাহায্য করিলেই তাঁহাদের আপনার লাভ। সামান্য পত্রিকার গ্রাহক বাড়িলে প্রধান পত্রিকার গ্রাহক বাড়িবে। যে সকল সামান্য পত্রিকা পল্লীগ্রামে নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে লীলা সম্বরণ করিয়াছে তাহারা প্রধান পত্রিকার উপকার করিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে কি উপায়ে বাঙ্গালার তিন লক্ষ লোকের হস্তে পাঠ্য পুস্তক সমর্পণ করা যায়। কি উপায়ে গ্রাম্য মুদি, গ্রাম্য চৌকিদার, ডাক হরকরা, মিসিওয়ালী, মুক্তাওয়ালী প্রভৃতি সকলেই এ বিষয়ে সহায়তা করে তাহার আন্দোলন আবশ্যক।

কণ্ঠমালা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদীর সন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন মুসলমান্ দারগা বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিল। শম্ভু যে নিকটেই আছে, একথা তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, অতএব নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে নানা বেশে, নানা ছলে, যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে রামদাস সন্ন্যাসীর সহিত তাহার আলাপ হইল, দারগা মনে করিল, রামদাস কোন ছদ্মবেশী "বদমায়েস" কি নিমিত্ত

তাহার এরূপ সন্দেহ হইল, তাহা দারগা স্বয়ংও বুঝিতে পারিল না; অথচ তাহার সন্দেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

রামদাস সুচতুর, দারগার সন্দেহ বুঝিতে পারিলেন। পাছে সেই সন্দেহ হইতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় দারগার মন অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু শম্ভু কয়েদীর অনুসন্ধান ব্যতীত আর কোন বিষয়ে দারগাকে অন্যমনস্ক করিবার উপায় নাই দেখিয়া শেষ শম্ভু কয়েদীর কথা উপস্থিত করিলেন। দারগা সে কথায় প্রথমে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কেবল মাত্র বলিল, "শম্ভু আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে? ইংরেজের রাজ্য, তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে, সে বিষয়ে আর আমি বড় ব্যস্ত নহি।"

রাম। উত্তম, আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি বিশেষ ব্যস্ত, তাহাই তাহার অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

দার। তবে তুমি কি তাহার কোন সন্ধান জান?

রাম। জানি বা না জানি, আপনি ত আর বড় ব্যস্ত নহেন।

দার। ব্যস্ত নহি বটে, কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে পারিলে ভাল হইত, না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

রাম। তবে কি না, আপনি অনুসন্ধান করিতে পারিলে আপনার সুখ্যাতি হইত, এক্ষণে অন্য দারগা অনুসন্ধান করিতে পারিলে তাহারই সুখ্যাতি হইবে। তাহা হউক, আপনার সুখ্যাতি অনেক আছে, এক কার্য্যে আপনি নিষ্ফল হইলে যে আপনার সকল সুখ্যাতি নষ্ট হইবে, কি অন্যে সফল হইলে যে আপনার অপেক্ষা সে উচ্চপদস্থ হইবে এমত নহে।

দার। তুমি কি শম্ভু কয়েদীর বিষয় কিছু জান?

রাম। বিশেষ কিছুই জানি না।

দার। তবু কি জান বল।

রাম। কই! আমি কিছুই জানি না।

দার। কিন্তু তোমার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, তুমি শম্ভুর বিষয় কিছু জান। যাহা জান তাহা যদি গোপন করিতে ইচ্ছা হয়, গোপন কর; সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলে অনেক বিষয় গোপন করিতে হয়, অনেক বিষয় গোপন রাখিতে পারা যায়। এক্ষণে আমি চলিলাম, প্রয়োজন হইলে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

রামদাস বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দারগা কোন মতেই থাকিলেন না, উঠিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত রামদাস দেখিলেন, যে তিনি গ্রামান্তরে গেলে দুই একটী মনুষ্য অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করে। কখন তাহারা নিকটে আইসে না অথচ চলিয়াও যায় না। রামদাস ভাবিলেন, "ইহারা দারগার চর; দারগা কি আমার পূর্ব্বপরিচয় পাইয়াছে? না, তাহা হইলে চর পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না। আমি কোথা যাই, কাহার সঙ্গে আলাপ করি, এই সকল তত্ত্ব লইতে ধূর্ত্ত মুসলমান্ ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, মনে করিয়াছে এই সকল তত্ত্ব লইলেই মহারাজের তত্ত্ব পাওয়া সহজ হইবে। ভাল, অদ্য হইতে আর আমি গ্রামান্তরে কি কোথায়ও যাইব না, দেখা যাউক, দারগা কি করে। কিন্তু আমি যে মহারাজের সম্বাদ জানি তাহা দারগা কিরূপে জানিল? যে রূপেই হউক তাহা নিশ্চয় জানিয়াছে, নতুবা এত লোক থাকিতে আমার উপর তাহার লক্ষ্য কেন হইবে। এক্ষণে উহার চক্ষে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করাবোধ হয় বৃথা হইবে। যদি দারগাকে ভুলান না যায় তবে কি কর্ত্তব্য, মহারাজের সন্ধান কি বলিয়া দিব? না—তাহা কখনই হইবে না। যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত এত দিন জেলে রহিয়াছেন, তাঁহার অনিষ্ট কখন করিব না। কখনই না। কিন্তু এক কথা আছে, সন্ধান বলিয়া দিলেই তাঁহার অনিষ্ট

কি হইবে? জেলে তিনি ছিলেন, আবার জেলে যাবেন, তবে আমরা তাঁহার প্রতিপালিত, তাঁহার আশ্রিত, যদি সন্ধান দিয়া কিছু উপকৃত হই, ক্ষতি কি! পতিত বৃক্ষের মূল কত কীটে খায়, যে কীট বৃক্ষপত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে কীট এক্ষণে মূল-ভক্ষণে প্রতিপালিত হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি? আর এক কথা আছে; যদি তিনি আপনি ধরা পড়েন, আর আপনার পরিচয় দেন, তাহা হইলেই ত আমি গেলাম। আর যদি আমি সন্ধান বলিয়া দিই তখন তিনি আত্মপরিচয় দিলে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না; তখন মেজেষ্টর সাহেব মনে করিবেন, যে কয়েদী মুক্তি পাইবার লোভে অন্যকে দায়গ্রস্ত করিতেছে। তাহাতে আমার কোন বিপদ্ নাই, অতএব এই যুক্তি ভাল। আমিই মহারাজকে ধরাইয়া দিব।”

চত্তাস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে মহারাজ মহেশ-চন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর যৎ-কালে মহারাণী পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, রামদাস তাঁহার সঙ্গে থাকেন। লোকে বলিত রামদাসের পরামর্শানুসারে মহারাণী গৃহত্যাগিনী হয়েন; সে কথা কতদূর সত্য প্রকাশ নাই, ফলতঃ রামদাস মহারাণীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু যাহারা রামদাসকে বিশেষ জানিত তাহারা বলিত রামদাস মহারাণীর পরম শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতেন; মহারাণী তাহা জানিতেন না, কেহ তাঁহাকে জানাইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু একদিন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল।

একটি চট্টিতে মহারাণীকে তিন চারি দিবস থাকিতে হই-

য়াছিল, শেষ দিন রাত্রে এক দল ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে, সেই দলের মধ্যে রামদাস ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া রামদাসের সহিত ডাকাতদিগের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ সূত্রে ডাকাতেরা আর একটি ডাকাতির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। রামদাস তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়ায় জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। যে ডাকাতদিগের সহায়তায় রামদাস দণ্ড পাইলেন, তাহারা রামদাসের প্রকৃত নাম জানিত না। রামদাস আপনাকে শম্ভু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা শম্ভু বলিয়া তাহাকে জানিত। নথিতেও রামদাস নাম উল্লেখ ছিল না। জজ সাহেবও রামদাসকে শম্ভু বলিয়া দণ্ড দেন।

দণ্ডাজ্ঞার পর যখন রামদাসকে জেলে লইয়া যায় তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রামদাস চারিজন কনেষ্টেবল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশব্দে যাইতেছেন এমত সময় একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার আর কে আছে?” রামদাস কহিলেন “আমার আর কেহই নাই থাকিলে আমি জেলে যাইতে সম্মত হইতাম না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম জেল আমার পক্ষে মন্দ নহে; আর আমাকে অন্ন চিন্তা করিতে হইবে না যাবজ্জীবন একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।”

আর একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তুমি

এই ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলে না। রামদাস কেবল মাত্র বলিলেন, "না।" আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কতক দূর আসিয়া রামদাস উদরের উপর হস্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকটে পুষ্করিণী আছে? একজন বলিল, আছে। রামদাস বলিলেন, সত্বরে সেই দিকে চল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কনেষ্টেবলগণ পথে দাঁড়াইল; রামদাস নিকটেই বসিলেন। প্রহরিগণ অন্যমনস্ক হইলে রামদাস বেগে পলাইলেন। "আসামী ভাগা" বলিয়া কনেষ্টেবলেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। আরও অনেকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল কিন্তু রামদাস দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; কনেষ্টেবলগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া; কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে এমত সময় কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছিল। তাহারা দূরে কনেষ্টেবলদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, আসামী এই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রামদাস বাস্তবিক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তথায় এক ব্রহ্মচারী বসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রামদাস তাঁহার গৈরিকবেশ দেখিবা মাত্র পাদমূলে পড়িয়া বলিলেন, প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমি কয়েদী আমার পশ্চাতে কনেষ্টেবল আসিতেছে। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদাস অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন "আমাকে শম্ভু ডাকাত মনে করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছে। আমি জেলে যাইতে যাইতে পলাইয়াছি। আমি শম্ভু নহি আমার নাম রামদাস; মহারাজ মহেশচন্দ্রের ভৃত্য ছিলাম। এক্ষণে পথে পথে ভিক্ষা করি।"

ব্রহ্মচারী আপন পরিচ্ছদ রামদাসকে পরাইয়া বলিলেন, তুমি অদ্যাবধি রামদাস সন্ন্যাসী হইলে। আপনি রামদাসের পরিচ্ছদ পরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমি অদ্যাবধি শম্ভু কয়েদী হইলাম। এই সময় কনেষ্টেবলগণ দ্বারে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী রামদাসের কর্ণে দুই চারিটি কি কথা বলিয়া একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখাইয়া দিলেন। কনেষ্টেবলরা দ্বার ভাঙ্গিয়া শম্ভু কয়েদীকে লইয়া গেল। কতক পথে গিয়া আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইল। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "ভয় নাই, তোমরা চল, এখন আমিই শম্ভু ডাকাত।"

আমরা এপর্য্যন্ত যাহাকে শম্ভু কয়েদী বা শম্ভু ডাকাত বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছি, তিনি ডাকাত নহেন, রামদাসের পরিবর্ত্তে জেলে গিয়াছেন। রামদাস এক্ষণে সেই ব্রহ্মচারীকে আবার পুলিষের হস্তে সমর্পণ করিবার মনস্থ করিয়া দারগার অন্বেষণে গেলেন।

দারগার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর রামদাস বলিলেন, "আপনি আগামী পরশ্ব রাত্রি দুই প্রহরের সময় মন্দিরের নিকট আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যাইবেন না। তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। আর যদি একাকী যান তাহাহইলে সকল সন্ধান পাইতে পারিবেন।"

দারগা উত্তর করিলেন, তবে কি শম্ভু ডাকাত তোমাদের নিকট আছে? রামদাস বলিলেন যে, এক্ষণে শম্ভু কোথায় তাহা আমি জানি না কিন্তু আগামী পরশ্ব রাত্রে আমার সহিত মন্দিরে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, এমত কথা বার্ত্তা হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তবে তাহাকে অনায়াসে

ধরা যাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথমে দেখা চাই। আমি কখন শম্ভুকে দেখি নাই, সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তাহাহইলে কোথা সে আপাততঃ বাস করিতেছে তাহা সন্ধান করিয়া লইতে পারিব। রামদাস সন্ন্যাসী বাস্তবিক শম্ভু কোথায় থাকে তাহা জানিতেন না। শম্ভু মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং যে দিবসে আসিবেন পূর্ব্বে তাহার স্থির থাকিত। শম্ভু বড় সাবধানী, পাছে লোক দেখিলে না আইসে এই আশঙ্কায় রামদাস অন্য লোক আনিতে দারগাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

দারগার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রামদাস আসিতে আসিতে ভাবিলেন যে, "শম্ভু বিশ্চয় ধরা পড়িবে। ধরা পড়িলে আর তাঁহারে এখানে রাখিবে না; অবশ্য দ্বীপান্তরিত করিবে। তাহাহইলে এই ধন ঐশ্বর্য্য সকলই মোহান্তের হইবে। কিন্তু মোহান্ত যদি যায় তাহাহইলে সকলই আমার হস্তে পড়িবে। শৈলর কথা বৃথা, তাহারে রাখিলে রাখিতে পারি মারিলে মারিতে পারি। এক্ষণে কি উপায়ে মোহান্তকে স্থানান্তরিত করি।"

এই দিবস অপরাহ্নে মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস তুমি এত অন্যমনস্ক কেন?" রামদাস বলিলেন "আমি আপনার অদৃষ্ট ভাবিতেছি।"

মহা। অদৃষ্টের কি ভাবিতেছ?

রাম। এই ভাবিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলাম কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সেই সংসারের পাপ সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এখানে সেই সংসারের কার্য্য করিতেছি। তবে, নিজের সংসার ত্যাগ করিয়া মহারাজের সংসার চালাইতেছি। তাঁহার অনুমতি পালন করিতেছি, তাঁহার কথায় বা মহাশয়ের কথায় কাহারে পীড়ন করিতেছি, কাহারও উপকার করিতেছি,

উপকার সংসারাশ্রমে থাকিয়াও করিতে পারিতাম, তবে সন্ন্যাসী হইয়া আমার কি ফল হইল।

মোহ। কই? আমার কথায় কাহারে পীড়ন করিতে হইয়াছে?

রাম। সময়ে সময়ে অনেক করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি যে দিবস শম্ভুকয়েদী খুন হইয়াছে এই কথা জেলখানায় রাষ্ট্র করিতে যাই, সে দিবস জেলখানায় বাস্তবিক দুই একজনকে প্রায় খুন করিতে হইয়াছিল। আপনি কাহাকেও মারিতে অনুমতি করেন নাই সত্য, কিন্তু না মারিলে কার্য্যোদ্ধার হইত না। অতএব আপনার অনুমতির নিমিত্ত সে অত্যাচার করিতে হইয়াছিল।

মোহান্ত অন্যমনস্ক হইলেন। রামদাস সময় পাইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন; মোহান্ত কোনটির উত্তর না করায় রামদাস দেখিলেন যে, মোহান্ত তখনও অন্যমনস্ক রহিয়াছেন কোন কথাই শুনিতেছেন না অতএব ক্ষান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মোহান্ত বলিলেন, "আমি লোকের অনেক উপকার করিয়াছি, মহারাজের কার্য্য ভার না লইয়া বনে বসিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিলে এত উপকার করিতে পারিতাম না।"

রাম। সে কথা সত্য, কিন্তু যে উপকারই আপনি কি আমি করিয়া থাকি তাহা অর্থের বলে করিয়াছি, অর্থ যাহার ধর্ম্ম তাহার; আমাদের ফল কি হইয়াছে? বিশেষতঃ অর্থোপার্জ্জিত ধর্ম্ম সংসারীর পক্ষে বিধি, আর আমাদের পক্ষে স্বতন্ত্র বিধি। আমি অনর্থক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম; আশ্রমোপযোগী কোন কার্য্যই করিতে না পারায় পতিত হইতেছি, এই ভাবনা আমার বড় হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি তাহাই ভাবিতেছি।

মোহান্ত অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, রামদাস তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল, আমার আর এখানে এক দণ্ড থাকাও উচিত নহে!

রাম। বিশেষতঃ এখানে দুই এক দিনের মধ্যে স্ত্রীহত্যা হইবে। শৈল নামে যে একজন যুবতীকে মহারাজ আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহাকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করায় তিনি স্বয়ং সে কার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শৈল জীবিত থাকিলে পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট ঘটাইবে।

মোহান্ত কর্ণেহস্ত দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "রামদাস, আর এসকল কথা শুনাইও না, শুনিলেও পাপ। আমি এক্ষণে চলিলাম, এস্থল ত্যাগ করিবার আয়োজন করি। এই চাবি লও, সমস্ত দ্রব্যাদি লও। তুমি মহারাজকে সকল বুঝাইয়া দিও, সকল বুঝাইয়া বলিও।

রাম। আপনি স্বহস্তে মহারাজকে এই চাবি দিয়া সকল বলিয়া গেলে ভাল হইত।

মহা। না, মহারাজ কি মোহিনী মন্ত্র জানেন; তিনি যাহাই বলেন, তাহাতেই আমাকে সম্মত হইতে হয়, কি জানি যদি আমার মতান্তর করিতে পারেন, আমার এই ভয়। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে যাওয়াই ভাল।

মোহান্ত উঠিয়া গেলে রামদাস একা বসিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ভাবিতে লাগিল। কি পাপ, মোহান্তটা এত বড় নির্ব্বোধ, এত সহজে ইহাকে যে তাড়াইতে পারিব, তাহা কখনই ভাবি নাই। এখন দেখা যাউক ইহার পর কি হয়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী এই দিবস বিনোদকে আসিবার নিমিত্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে আবশ্যক হইয়াছে, পত্রে তাহা কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল মাত্র লিখিত আছে "রাত্রি দুইপ্রহরের সময় মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বটবৃক্ষমূলে আমার সহিত অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেন। দুইপ্রহরের পূর্ব্বে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; দুইপ্রহরের পরে আসিলে আপনি কোন বিশেষ সুখে এজন্মের মত বঞ্চিত হইবেন।"

পত্রখানি পাইয়া বিনোদ দুই তিনবার পাঠ করিলেন; কেন সন্ন্যাসী যাইতে বলিয়াছেন, তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না; আবার পত্র পাঠ করিলেন, তাহার পর পত্রখানির এপৃষ্ঠা ওপৃষ্ঠা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, শেষ পত্রখানি পূর্ব্বমত মুড়িয়া বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। অনেক দূর যাইতে হইবে অতএব যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিনোদ স্বভাবতঃ শান্ত; ইদানীং আরও শান্ত হইয়াছেন; আর শোক তাপ নাই, রাগ দ্বেষ নাই, কোন অভিলাষ নাই, একাকী কালাতিপাত করেন। পৃথিবীর শোভা আর বুঝিতে পারেন না, মেঘ দেখিলে আর মাতিয়া উঠেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত পুষ্পেরদিকে আর ফিরিয়া চান না, চন্দ্রোদয় হইলে আর বিচলিত হয়েন না। কেবল মাত্র এক দিবস ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটি নক্ষত্রকে একা জ্বলিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। শয্যা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া সেই নক্ষত্রটি দেখিয়াছিলেন। হয়ত নক্ষত্রটি একাকী জ্বলিতেছে বলিয়া তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অথবা নক্ষত্রটির সহিত

আপনার সাদৃশ্য অনুভব করিয়া তাহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসীর সাঙ্কেতিক মন্দিরের নিকট বিনোদ উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি বটবৃক্ষ আর দুই একটি করবীর ঝাড় রহিয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই নদীর বিশালবক্ষ চন্দ্রকিরণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। নদীর গম্ভীর গর্জ্জন বিনোদের কর্ণে শোকধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; ক্রমে সেই শব্দে বিনোদের অন্তর ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন দিবসে কি শোকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যেন তাহার তরঙ্গ এখনও অন্তরে উছলিতেছে। বিনোদ তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ঘটনাই স্মরণ হইল না, অথচ তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই সন্তাপিত অন্তরে বিনোদ ধীরে ধীরে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি করবীর বৃক্ষপার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, দুই জন দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে; তাহাদের দেহ নদীবক্ষে চিত্রিত রহিয়াছে। বিনোদ বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। একজন বলিতেছে, "আমার বড় শীত করিতেছে, আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারি না, কেন আমাকে আনিলে বল, নতুবা আমি চলিয়া যাই।" অপর ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি যাবে কোথা? তোমার আর স্থান কোথা? তোমার স্থান এই নদীগর্ভে, ইচ্ছা হয় যাও।" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "উপহাস রাখ, আমার মত দুর্ভাগিনীকে উপহাস করিলে আর তোমার কি লাভ?" বিনোদ চিনিলেন, এ তাঁহার শৈল, সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতেছে।

রামদাস সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি উপহাস করি নাই। প্রকৃত কথাই বলিয়াছি, ঐ নদীগর্ভে তোমার স্থান তাহার অন্যথা হইবে না, এখনই তাহা জানিতে পারিবে।"

শৈ। কেন, নদীগর্ভে আমার স্থান? কে বলে? কাহার সাধ্য?

রাম। আমি বলি, আমার সাধ্য।

শৈ। কে তুই? কোথাকার কে তুই, নচ্ছার? ঝাঁটা পেটা করিব জানিস্ না।

রাম। গালি দেও, তোমার সময় অল্প। আর সময় অধিক থাকিলেই বা কি হইত; জীবনধারণ কি কষ্ট তাহাও ত দেখিলে?

শৈল অতি মৃদুভাবে আপনাপনি বলিতে লাগিল, আমার বয়স অল্প, তাহাই মরিতে ইচ্ছা নাই। আমার বড় সাধ আবার সংসার করি।

রাম। কাহার সঙ্গে? বিলাস বাবুর ত শেষ দশা; দুই পাঁচদিন আর তাঁহার বিলম্ব। বিনোদ বাবুর আশা ত তুমি করই না। করিলেই বা কি হইবে?

শৈ। কেন?

রাম। তিনি আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "আমার প্রতিমার বিসর্জ্জন আমি আপনিই করিব।" অদ্য এখনই তিনি তোমায় বিসর্জ্জন করিতে আসিবেন।

শৈল আর কথা কহিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। রামদাস একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, বিনোদ এলেন না, তাঁহার সময় অতীত হইয়াছে আর বিলম্ব কেন করি। তাহার পর শৈলকে বলিলেন, শৈল তোমার সময় উপস্থিত। শৈল কথা কহিল

না। শৈলের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তথাপি শৈল কথা কহিল না; অঙ্গ দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, শৈল সেইরূপ রহিল। তাহার পরই সম্মুখে গগনভেদী একটি চীৎকার হইল। "সন্ন্যাসী কি করিলে?" বলিয়া সঙ্গেং পশ্চাতে আর একটী চীৎকার হইল। সন্ন্যাসী চমকিয়া স্কন্ধ ফিরাইলেন, পশ্চাতে কেহই নাই। নিম্নে নদী দেখিতে মস্তক নত করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে আর একটি চীৎকার মিশাইয়া গেল, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার পশ্চাতে মস্তক ফিরাইলেন, কেহই নাই; তৎক্ষণাৎ আবার নদী প্রতি চাহিলেন কেহই নাই। স্রোত ছুটিতেছে, নদী গর্জ্জিতেছে, আর কেহই নাই; কেবল একটি ভীষণ পক্ষী নদীবক্ষ দিয়া উড়িয়া গেল। বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। শৈল এই মাত্র যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই স্থানের প্রতি চাহিলেন। শৈল এই মাত্র ছিল, এই মাত্র কথা কহিয়াছিল, শৈল আর সেখানে নাই; সন্ন্যাসী আবার নদীর দিকে মস্তক নত করিলেন এই সময় পূর্ব্বমত চীৎকার তাঁহার অনুভব হইল; চীৎকার কোথা হইতে হইল? পশ্চাতে দেখিলেন, পার্শ্বে দেখিলেন, শেষ ঊর্দ্ধে চাহিলেন; ঊর্দ্ধে চন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নক্ষত্রগণ নদীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নদীর যে স্থানে শৈল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, নক্ষত্রগণ যেন ঠিক সেই স্থানের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

করবীর অন্তরালে বিনোদ নাই। শৈলকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ জলে ঝাঁপ দিয়াছেন। সন্ন্যাসী পশ্চাতের চীৎকারে বিনোদের গলা চিনিতে পারেন নাই।

নক্ষত্রের প্রতি।

১

মেঘাচ্ছন্ন অমা নিশা;—আঁধার আকাশে,
ভেসে যায় মেঘ কালো, তার মাঝে করি আলো,
বসিয়া তারকা এক মৃদু মৃদু হাসে।
কভু বা লুকায় মেঘে কভু বা প্রকাশে।

২

"কে তুমি তারকা, আজি দেখা দিলে মোরে,
কেন এ অভাগা নরে, জ্বালাইব মনে করে,
খেলিতেছ লুকাচুরি কাদম্বিনী কোরে।
তিতাইছ কেন মোরে নয়নের লোরে।

৩

তব মত এক তারা হৃদয় অম্বরে,
কত দিন ফুটেছিল, হঠাৎ সে লুকাইল,
জনমের মত কাল অনন্ত সাগরে।
পাগল তখন হতে আমি তার তরে।

৪

তুমিত লুকায়ে পুনঃ আপনা প্রকাশ,
লুকায়ে সে একবার, কেন না বাহিরি আর,
হাসিলনা তব মত সুমধুর হাস।
কেন সে ত্যজিল তার আবাস আকাশ।

৫

গেছে বটে ত্যজে;—কিন্তু স্বপন কৃপায়,
হৃদাকাশে আসি হাসি, ফুটে দুখতম নাশি,
কিন্তু যবে যায় ত্যজে স্বপন আমায়,
তখনি সে তারা মোরে ত্যজিয়া পলায়।"

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যাত্রা।

যাঁহারা আধুনিক যাত্রার নৃত্য গীত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মহাপুরুষ। আবার যে মহাত্মারা অভিনেতৃগণের বেশ ভূষা দেখিয়া, বা কথা বার্ত্তা শুনিয়া মোহিত হয়েন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী। কেলুয়া ভুলুয়ার সঙ্গে যে মেতরাণী আইসে যাত্রায় রাণীর প্রয়োজন হইলে সেই উঠিয়া দাঁড়ায়; মেতরাণীর পর রাণীর পদ আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কথায় বার্ত্তায় রাণী ও মেতরাণীতে বড় প্রভেদ নাই, পরিচ্ছদে কিছু থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু যাত্রাওয়ালারা তাহা বড় জানে না; তাহারা রাণী কখন দেখে নাই, আপনাদিগের পরিবার দেখিয়া রাণীর ভাব ভঙ্গী অনুভব করিয়া রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আপন পরিবারের অনুকৃতি সাজাইয়া দেয়। দর্শকেরা সেই রাণীকে অন্য স্থানে দেখিলে হয় ত জেলেনী কি মালিনী ভাবিতেন, কিন্তু যাত্রায় তাহাকে রাণী ভিন্ন অন্য ভাবিবার উপায় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে কার্য্য গতিকে তাহাকে কখন মেতরাণী, কখন খেমটাওয়ালী, কখন বাজিকর বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা পরিচয়ে বুঝিয়া লইতে হয়, পরিচ্ছদে নহে। কোন অবস্থাতেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হয় না, রাণী, মেতরাণীর এক পরিচ্ছদ। সকল অবস্থাতেই সালুর শাটী বা ঢাকাই শাটী।

রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান্, আর তৈলাক্ত জরীর টুপি। সেই পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন। একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদই লোকের পরিচায়ক। কে যোদ্ধা, কে পদাতিক, কে

জজ, কে শিল্পী, তাহার পরিচয় পরিচ্ছদে পাওয়া যায়। এই কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের যাত্রা সম্বন্ধে ইহা খাটে না। আমাদের যাত্রায় কি রাজা, কি দাস, সকলেই এক পরিচ্ছদধারী। চাপকান্ তাহার মধ্যে প্রধান। বাজীকরের "বন মানুষের হাড়" স্পর্শ মাত্র সকলের পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ যাত্রাকরের চাপকান্ পরিধান মাত্র, সকলের রূপান্তর করে। রাজা সাজিতে হইবে, চাপকান আবশ্যক। নৃসিংহদেব সাজিতে হইবে, সেই চাপকান আবশ্যক। হনুমান্ সাজিতে হইবে, আবার সেই চাপকান আবশ্যক। বুঝি চাপকান পরিলে হনুমানের মত দেখায়।

আমাদের যাত্রাকরেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয় ত ভূমিকর্ষণ করিত, বা নৌকা চালাইত কিম্বা ভারবহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একবার সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি কতকগুলি যুবা বাবু যাত্রাকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপর যাত্রাকরদিগের ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া মার্জ্জিতরুচির উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আমরা আহ্লাদিত চিত্তে তাহা দেখিতে গেলাম; পথে শুনিলাম, সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে, আমাদের আরও আহ্লাদ হইল। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি, মোগলাই পাগড়ি মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত, চস্‌মা নাকে, হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতকগুলি লোক কথা বার্ত্তা কহিতেছে। পরে শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যেই একজন রাম, একজন লক্ষ্মণ, আর সকলে পারিষদ। আমরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম। সুশিক্ষিত যুবারা ভাবিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল সদৃশ ছিলেন। তিনি চস্‌মা নাকে দিতেন, মুসলমান্ দিগের মত পাগড়ি মাথায় দিতেন, সাহেব-

দিগের মত আলবার্ট চেন পরিতেন। আমাদের অদৃষ্টই মূল!

আর একবার একদল কেরানির অভিনীত যাত্রায় দেখা গিয়াছিল, সীতা রেসমের রাঙ্গা রুমাল মাথায় বাঁধিয়া নাচিতেছেন। সূর্য্যের কিরণ লাগিলে মেচোবাজারের অধিবাসিনীরা যেরূপ ভঙ্গীতে রুমাল মাথায়দিয়া চিবুকনিম্নে গ্রন্থি দেয়, সীতা সেইরূপে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। আমরা একজন যুবা বাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে রাত্রে সূর্য্যকিরণের ভয় নাই, রুমাল সে জন্য বাঁধা হয় নাই, তবে ওষ্ঠলোম ঢাকিবার নিমিত্ত ওরূপ করিয়া বাঁধা হইয়াছে।

যেরূপ পরিচ্ছদ, তাহার অনুরূপ কথাবার্ত্তা। রাণীই হউন, আর মেতরাণীই হউন, একই পরিচ্ছদ; রাণীই হউন, আর মেতরাণীই হউন, একরূপ কথাবার্ত্তা। পরস্পরের যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইলে পরস্পরের কথা স্বতন্ত্র হইবে, তাহা যাত্রাকরেরা বড় জানে না; যাত্রাকরেরা কেন? অনেক আধুনিক নাটক প্রণেতারাও তাহা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা মনে করেন বুঝেন, দেখা গিয়াছে, তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝেন যে, কথাবার্ত্তা স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থার লোককে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করান। তাঁহারা কোন ইতর লোককে কথা কহাইতে হইলে ইতর ভাষায় কথা কহাইয়া থাকেন, কোন ভদ্রলোককে কথা কহাইতে হইলে সাধু ভাষা প্রয়োগ করান। কিন্তু যে স্থলে উভয়েই ভদ্রলোক কি উভয়েই ইতর লোক, উভয়েই এক প্রকার ভাষা ব্যবহার করে, সে স্থলে বড় গোলযোগ হয়; ভাষার মর্ম্মও এক হইয়া পড়ে।

স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র গতি, স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের ভাষা এক হইতে পারে কিন্তু ভাষার মর্ম্ম স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা আমাদের দেখাইয়া দিলে আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু তাহা স্বয়ং

দেখাইতে পারি না। তাহা কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমাদের যাত্রাকরেরা প্রতিভাশালী নহে, তাহাদের নিকট এ সকল নির্ব্বাচনের প্রত্যাশা করি না। এমন বলি না যে, শ্রীরামচন্দ্রের মত তাহারা কথা কহিতে পারিবে, বা লক্ষ্মণ কথা কহিলে, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি একেবারে লক্ষ্য হইবে না। যাত্রার কি গ্রন্থে বক্তাদিগের প্রকৃতি রক্ষা করা অতি কঠিন।

এক্ষণে আমাদের যাত্রায় কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়া থাকে, দেখা যাউক। প্রকৃতিপ্রভেদ জ্ঞান দূরে থাকুক, যে কথোপকথন হইয়া থাকে তাহা শুনিলে বিরক্ত হইতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে তাহা দেখান যাইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে জানকীকে বনে পাঠাইলেন। জানকী পূর্ণগর্ভা, পদব্রজে কতকদূর গমন করিয়া বড় ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "লক্ষ্মণ আর যে আমি চলিতে পারি না।"

'লক্ষ্মণ। কি বলিলেন মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না?

'জানকী। না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে।

'লক্ষণ। সে কিরূপ, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সে কিরূপ, তাহা ত জানকী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবার কি অধিক প্রকাশ করিয়া বলিবেন? তথাপি লক্ষ্মণ বলিতেছেন, "প্রকাশ করিয়া বলুন।" বোধ হয় এই "প্রকাশ করিয়া বলুন" কথার অর্থ গীত গাইয়া বলুন। "এস্থলে প্রকাশ করিয়া বলুন" কথায় কাহার না রাগ হয়? জানকী গাইলেন, "গর্ভবতী নারী,

চলিতে কি পারি, হইয়াছে অঙ্গ অবশ।” গীতে নূতন কথা আর কিছুই প্রকাশ হইল না; জানকী পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, গীতে কেবল তাহাই প্রকাশ করিলেন, তবে গীতের কি প্রয়োজন ছিল? একভাব উপর্য্যুপরি দুই তিনবার শুনিতে গেলে আর তাহাতে অন্তর আর্দ্র হয় না, তখন সীতার নিমিত্ত দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আবার রাগ জন্মে। যাত্রাওয়ালার পরিশ্রম বিফল হয়। যাত্রা যে “জমে না” তাহার কারণ এই।

এই সংক্রান্ত আর একটি কথা আছে, এক কথা লক্ষ্মণকে দুই তিনবার বলায় হঠাৎ বোধ হয়, লক্ষ্মণ কিছু বধির। আবার তাহার পরে মনে হয় যাত্রায় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি সকলেই এইরূপ কিছু কিছু বধির; সকলকেই এক কথা দুইবার তিন বার করিয়া বলিতে হয়; একবার এদিকে মুখ ফিরাইয়া এক বার ওদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে হয়। কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া না বলা হউক বক্তা আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া বলেন। আর, যদি যাত্রার দলের লক্ষ্মণ বধির না হন, তবে তিনি বড় নির্ব্বোধ ব্যক্তি। জানকী বলিলেন, “আর আমি চলিতে পারি না।” এই সামান্য কথা তাঁহার বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারিল না; তিনি সেই কথা পুনরুক্ত করিয়া ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, “কি বলিলেন, মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না?” সীতা আবার বুঝাইয়া দিলেন, “না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না।” তথাপিও লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন না, তখনও লক্ষ্মণ আবার বলিতেছেন, “সে কিরূপ প্রকাশ করে বলুন। বুদ্ধিমান্ শ্রোতা মাত্রেরই এরূপ লক্ষ্মণ অসহ্য। লক্ষ্মণের “কি বলিলেন,” কথাটীই অসঙ্গত।

কথা বার্ত্তার এই একটি উদাহরণ লইয়া আমাদের এত সময় গেল, কাজেই এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইতে পারিল না।

ভ্রমর

মাসিক পত্র।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮২সাল। ১৪ সংখ্যা।

কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনে লোকের আর বড় রুচি নাই, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলেন যে, “কীর্ত্তনে টপ্পার মজা পাওয়া যায় না, উহার ভাষা বুঝা যায় না সুরও ভাল লাগে না।”

কীর্ত্তন যে কেন ভাল লাগে না তাহার মূল কারণ “কীর্ত্তনের ভাষা বুঝা যায় না।” ভাষা বুঝিলে সুরও ভাল লাগিত, “টপ্পা” অপেক্ষা অধিক “মজাও” পাওয়া যাইত।

কীর্ত্তনের ভাষা অতি সরল, কেবল তাহার গুটিকত কথা এক্ষণে আমাদের মধ্যে আর ব্যবহার নাই; এই গুটিকত কথা অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।* আমাদের মধ্যে

* এইস্থলে কয়েকটী কথার অর্থ সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করা গেল। ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে।

দিঠি—দৃষ্টি	পেখিনু—দেখিনু
বিহি—বিধি	লোর—চক্ষের জল
গেহা—গৃহ	সোই—সেই

অনেকে আইরিস বালাড্‌স(Irish Ballads) পড়িবার নিমিত্ত আয়র্লণ্ড দেশের অপ্রচলিত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু নিজ দেশের রত্নভোগ করিবার নিমিত্ত দুইটা পুরাতন কথার অর্থ সংগ্রহ করেন নাই। যদি তাঁহারা এই সামান্য শ্রমস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রম নিতান্ত বৃথা হইবে না।

এক্ষণে কীর্ত্তনের আদর নাই বলিয়া ক্রমে কীর্ত্তন লোপ পাইতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় কীর্ত্তন কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে। কলিকাতাঞ্চলে কীর্ত্তন একেবারেই নাই, ঢপের গীতকে তথায় কীর্ত্তন বলে। তথাকার অনেকে ঢপ শুনিয়া কীর্ত্তনের প্রতি দেশ প্রকাশ করেন।

আবার অনেকের কৃষ্ণ বিষয়ক গীতে বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা বলেন রাধাচরিত্র নীতিবিরুদ্ধ। রাধা একের পত্নী হইয়া অন্যকে ভাল বাসিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার গল্প পবিত্র সংসারে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পবিত্র সংসারে রাধাকলঙ্কিনী অপরিচিতা? তাঁহার পরিচয়ে কোন্ সংসারে অনিষ্ট ঘটিয়াছে? যদি রাধা কলঙ্কিনীর নাম আমরা বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া দিই, তথাপি অনেক কলঙ্কিনীর নাম

আন্—অন্য
বৈঠল—বসিল
ভেল—হইল
শুনইতে—শুনিতে
মাসা—মাস
দেহা—দেহ
মঝু—আমার
পয়ান—পলায়ন
অবহুঁ—এখন
আওব—আসিবে
সাঙন—শ্রাবণ
ঝাপল—ঢাকিল
মুরছি—মূর্চ্ছা
কৈছন—কেমন
বাট—পথ
বরিখা—বৎসর
পাস—নিকট
যবহুঁ—যেপর্য্যন্ত
ঠাম—স্থান
কোর—কোল
জনু—যেন
নিয়ড়—নিকট

থাকিবে। কলঙ্কিনী গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়; একা রাধার নাম উঠাইয়া কি হইবে? কীর্ত্তনের কলঙ্কিনী অপেক্ষা পাড়ার কলঙ্কিনী অধিক অনিষ্ট করে। রাধা কলঙ্কিনী বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তন শুনেন না, তাঁহারা সাবধানী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা প্রায় কণ্টকের ভয়ে গোলাপ ত্যাগ করেন।

কীর্ত্তনে কবিত্ব আছে, এইজন্যই বাঙ্গালির পক্ষে কীর্ত্তন আদরের ধন হওয়া উচিত। সুখদ রস বাঙ্গালির যত হৃদয়গ্রাহী এত আর অন্য কোন দেশীয়দিগের নহে। তাহার কারণ কি, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটী সত্য। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বাঙ্গালির অন্তঃকরণ অতি কোমল; এত দয়া, এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত আহ্লাদ আর কোন দেশীয় দিগের মধ্যে দেখা যায় না। যে অন্তঃকরণ কোমল সেই অন্তঃকরণই রসের আধার; কেবল কাব্য রস নহে, অন্তঃকরণ কোমল হইলে সুখদ রস মাত্রেই অধিকার জন্মে।

বাঙ্গালি এত রসপ্রিয় কেন, বাঙ্গালির অন্তঃকরণ এত কোমল কেন, জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কোন উত্তর দিতে সক্ষম নহি। দেশবিশেষের গঠন দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত, অধিবাসীদিগের স্বভাব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; যে দেশে কেবল প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বত, ফল নাই, ফুল নাই সে দেশের লোকের অন্তঃকরণ অতি কঠিন বলিয়া তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালির অন্তঃকরণ যে কেন কোমল তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। বঙ্গালার মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল, পর্ব্বত নাই, পাহাড় নাই, একখানি কঠিন প্রস্তর পর্য্যন্তও নাই; সর্ব্বত্রই ফল ফুল, সকল দ্রব্যই নয়নরঞ্জক। কাজেই বাঙ্গালির অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল সতত রসপূর্ণ।

যে দেশে "কঠিন মাটী" বা যে দেশ কেবল পর্ব্বতময় সে

দেশের অধিবাসীরা বহুকষ্টে শষ্যোৎপাদন করে, বহুশ্রমে জীবন ধারণ করে। পরিশ্রমে বলবৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু অধিক পরিশ্রমে রসগ্রাহিণী শক্তিকে দুর্ব্বল করে। যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পরিশ্রম বাড়িতেছে, সেই পর্য্যন্ত সকল রসেই বাঙ্গালির প্রবৃত্তি কমিতেছে; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালায় যে পরিমাণে রসপ্রিয়তা রহিয়াছে তাহা আর কুত্রাপি নাই।

(আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালির অন্তঃকরণ কোমল। কোমল বলিয়া বাঙ্গালির শোক অধিক। না কাঁদিলে কাব্য জন্মে না। ইংলণ্ড স্বাধীন, কখন কাঁদে নাই, ইংলণ্ডের কাব্য সামান্য; ইংরাজিতে যাহাকে Poetry বলে, ইংলণ্ডে তাহা অতি অল্প। আয়র্লণ্ড পরাধীন, অনেক কাঁদিয়াছে এই জন্য ইংলণ্ড অপেক্ষা আয়র্লণ্ডে Poetry অধিক। স্বাধীনতার নিমিত্ত আমরা কখন কাঁদি নাই, স্বাধীনতা আমরা কখন গ্রাহ্যও করি নাই, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ কোমল, কাঁদিতে পারি; অন্যের নিমিত্ত অনেক কাঁদিয়া থাকি এইজন্য আমাদের দেশে Poetry বা রস অধিক। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় Poetry শব্দের অনুরূপ কোন কথা পাই নাই বলিয়া রস শব্দ প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু রস শব্দে অনেকে সামান্য রস বুঝেন, অনেকে আবার আদিরস ভাবেন। রসিক শব্দের অর্থ আরও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।)

আর এক কথা। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, পৌত্তলিক ধর্ম্ম কাব্য রসোদ্দীপক। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কাব্য রস অধিক হওয়া সম্ভব, কেন না আমরা পৌত্তলিক। বাঙ্গালায় যখন সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন এদেশে কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরে যখন তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, তখনকার কবি একা জয়দেব। কিন্তু তিনি নিজে তান্ত্রিক ছিলেন না। ঘোর তান্ত্রিক কেহ

কখন কবি হয় নাই। তাহার পর যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি পরস্পর সকলেই বৈষ্ণব না হউন তাঁহারাও এই সময়ের ব্যক্তি। আবার এই সঙ্গে যদি নালুনন্দলাল, হরুঠাকুর, নিতাইদাস, রামবসু প্রভৃতিকে গণনা করা যায় তাহা হইলে আমাদের কবির সংখ্যা অল্প হইবে না। তান্ত্রিক সময় কিছুই ছিল না, আবার বৈষ্ণবাধিকারে অসংখ্য কবির আবির্ভাব হইল, ইহাদ্বারা বোধ হয় যে পৌত্তলিক ধর্ম্মমাত্রই কাব্যরসোদ্দীপক নহে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম যে রসোদ্দীপক ইহার প্রমাণ আমাদের দেশে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

যশোদার পবিত্র স্নেহ, রাধিকার অকৃত্রিম প্রেম, রাখালদিগের সখ্য ভাব বাঙ্গালায় নিষ্ফল হয় নাই, ইহার ফল মহাজন কবি। তান্ত্রিক ধর্ম্মে কোন সুখদ মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে পায় না, বরং তাহা অঙ্কুরেই নষ্ট হয় এই জন্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের সময় বাঙ্গালায় কবি ছিল না।

আমাদের দেশে যত শ্রেষ্ঠ কবি জন্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণবিষয়ক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অধিক এবং তাহারাই অন্য কবির মধ্যে প্রধান। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র এই চারি জন লব্ধনামা কিন্তু তাঁহাদের সকলেই মহাজন নহেন; কেহ বাল্মীকির খাতক, কেহ ব্যাসদেবের খাতক, কেহ বা সকলেরই খাতক। এই কথা কত দূর সত্য তাহা আপাততঃ দেখাইবার স্থানাভাব। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে সকলেই মহাজন নহেন কিন্তু যাঁহারা

মহাজন তাঁহারা সকলের নিকট পরিচিত নহেন; কেন না আমরা সকলেই গুণগ্রাহী নহি।

আমরা বলিয়াছি যে, বঙ্গকবিদিগের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরা শ্রেষ্ঠ আবার বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে গেলে কবির কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হয় কিন্তু এত কথার পর এক্ষণে সে আলোচনা যে সকলের আর ভাল লাগে এমত বোধ হয় না; তথাপি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

কোন কবি পৃথিবীর বাহ্যবস্তু চিত্র করেন, কেহ বা মনুষ্য-হৃদয় চিত্র করেন। যিনি বাহ্যবস্তু চিত্র করেন তাঁহার কার্য্য কতক সহজ। তিনি নীল আকাশ দেখিয়াছেন, জলপূর্ণ নবমেঘ দেখিয়াছেন, কোমল পুষ্প দেখিয়াছেন, ঘোর অন্ধকার দেখিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই চিত্র করেন। কিন্তু যে কবি মনুষ্যহৃদয় চিত্র করেন তাঁহার কার্য্য কঠিন। তিনি যাহা চিত্র করেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা তাঁহাকে অনুভব করিয়া লইতে হয়। যিনি বাহ্য বস্তু বর্ণনা করেন তিনি অবিকল বর্ণনা করিতে পারিলেই তাঁহার প্রশংসা, আবার তাহাতে কল্পনা মিশাইতে পারিলে আরও প্রশংসা। সাদৃশ্য কল্পনাই তাঁহার প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যার সময় নক্ষত্র অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, কোনটি দেখা যাইতেছে আবার কোনটি দেখা যাইতেছে না এই বলিলে হয় ত বর্ণনা সম্পন্ন হইত কিন্তু তাহাতে কবিত্ব থাকিত না। এস্থলে ফুলের সহিত নক্ষত্রের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া নক্ষত্র "ফুটিতেছে" বলিলে কবিত্ব রক্ষা হইল। তদ্রূপ, আকাশের সহিত সমুদ্রের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া "আকাশে শশী ভেসে যায়" বলিলে

রস হইল। উপমায় ও সাদৃশ্য কল্পনায় কালিদাস পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তৎকৃত রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী এই গুণে বিশেষ বিখ্যাত।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং তদেব নৈসর্গিক মুন্নতত্বম্
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপইব প্রদীপাৎ।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। পিতার ন্যায় অবিকল পুত্র হইল যেন দীপশিখা হইতে দীপশিখা জন্মিল।

এ সকল উপমা, রূপক, কল্পনা, কবিত্ব সকলই সুন্দর; ইহার কবিরাও ক্ষমতাবান্ কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মনুষ্য-হৃদয় চিত্র করেন তাঁহারা আরও ক্ষমতাবান্। তাঁহারা নূতন সৃষ্টি করেন। তাঁহারা মনুষ্য হৃদয় দেখেন নাই বুঝিয়াছেন। যাহা দেখা নাই তাহার অবিকল চিত্র হয় না কিন্তু যাহা বুঝা গিয়াছে তাহার স্বরূপ চিত্র হইতে পারে। যদি কোন মনুষ্য-হৃদয় অবিকল চিত্রিত হইতে পারিত তাহা হইলে যে মনুষ্য আছে বা ছিল তাহারই অনুকরণ হইত মাত্র, নূতন কিছুই হইত না। কিন্তু যে মনুষ্যহৃদয় কখন ছিল না, এই কবিরা তাহাই চিত্রিত করেন। এইরূপে সীতার উৎপত্তি। সীতা কাহারও গর্ভে জন্মান নাই বাল্মীকি তাহা আপনিই বলিয়া দিয়াছেন। সীতা জনকের কন্যা, জননীর নহে। সীতা বাল্মীকির মানস কন্যা, বিধাতার সৃষ্টি নহে; অথচ সৃষ্টা মানবী অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠা। এত পতিভক্তি, এত প্রণয়, এত ক্ষমা, এত সহ্য, এত অভিমান, এত নম্রতা কখন মানবীর হয় নাই। এ পৃথিবীতে কখন সীতার তুল্য স্ত্রীলোকের পদস্পর্শ হয় নাই।

এইজন্য বলিতেছিলাম বাহ্য বস্তুর চিত্রকর অপেক্ষা, হৃদয় চিত্রকর শ্রেষ্ঠ। যে কবিরা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাঁহারা

হৃদয়চিত্রকর। তাঁহারা রাধার হৃদয় চিত্র করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় রাধার সকল অন্তর্বৃত্তি চিত্র করেন নাই; কেবল তাঁহার প্রণয় চিত্র করিয়াছেন। সেই চিত্র এত সম্পূর্ণ যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না; প্রণয়ের অতি সূক্ষ্ম উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত যেন অণুবীক্ষণে দেখিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

কতকগুলি গীত উদ্ধৃত করিয়া উপরোক্ত কথা প্রতিপন্ন করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিকটে গ্রন্থ না থাকায় তাহা হইল না; বারান্তরে চেষ্টা করা যাইবে, আপাততঃ কেবল দুই একটি গীতাংশ যাহা স্মরণ হইল তাহাই সন্নিবেশিত করা গেল। আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এই গীত কয়েকটী তাহার অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ নহে, অথচ নিতান্ত মন্দও নহে। প্রথমতঃ কৃষ্ণের নিমিত্ত রাধার অবস্থা বর্ণন।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাইয়া পরে॥

"ভূষণ খসাইয়া পরে" এই পরিচয়টি অসাধারণ ভাব ব্যঞ্জক। এতদ্দ্বারা মনের অবস্থা যে কতদূর প্রকাশ হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয় তাহা সকলে বুঝিতে সক্ষম নহে। যে কথা দশ পরিচ্ছেদ লিখিলেও প্রকাশ হইত না, তাহা তিনটি কথায় প্রকাশ হইয়াছে।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমত যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনি, দেখয়ে খসাইয়া চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয় বন্ধুর সনে॥

মেঘ, কেশ প্রভৃতির বর্ণে কৃষ্ণের বর্ণ সাদৃশ্য স্মরণ থাকিলে এই গীতের অর্থ ও সৌন্দর্য্য বুঝা যাইবে।

কৃষ্ণবিরহে রাধা যখন জানিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত, সেই সময়ের উক্তি—

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি॥
* * * *
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম॥
এই সব অভরণ দিও পিয়া ঠাম।
জনমের মত মোর এই পরণাম॥

এই গীতটি বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইহা তাঁহার রচিত না হইলেও তাঁহার তুল্য ব্যক্তির রচিত বটে। "যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি। সেখানে লিখিও মোর নাম দুইচারি।" তাহাতেও রাধার সুখ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কৃষ্ণ সেই নাম অবশ্য পড়িবেন, পড়িলে রাধাকে স্মরণ হইবে, রাধার তাহাই সুখ; হয় ত রাধার নিমিত্ত একটু নয়নাশ্রু মুছিবেন, রাধার আরও সুখ। "এই সব অভরণ দিও পিয়া ঠাম।" অভরণ দেখিলে কৃষ্ণ চিনিতে পারিবেন, রাধার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, একান্ত না জিজ্ঞাসা করেন, তথাপি রাধাকে তাঁহার স্মরণ হইবে, রাধা আর নাই অভরণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন, অভরণ রহিয়াছে সে রাধা নাই, ভাবিয়া কাঁদিতেও পারেন এই মনে করিয়াও রাধা সুখী; রাধা মরিতে বসিয়াও কৃষ্ণ প্রেমের

অভিলাষী। জীবিতে তাহা পাইলেন না, মরিলে পাইবেন এই আশায় রাধার সুখ।

আবার "সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম" অর্থাৎ আমি মরিলেও নাম করিও। সখীগণের যখন একে একে নাম হইবে সেই সঙ্গে আমার নাম করিও। আমি মরিয়াছি বলিয়া আমায় ভুলিও না, যাহাদের সঙ্গে একত্রে আমি থাকিতাম, ভ্রমিতাম, কৃষ্ণের নিমিত্ত কাঁদিতাম, আমার নাম তাহাদের সঙ্গ ছাড়া করিও না।

যাঁহাদের রসবোধ নাই তাঁহাদের উদ্দেশে আমরা এই গীতগুলির অর্থ করিতে গিয়া বোধ হয় গীতের রসভঙ্গ করিয়াছি, রসজ্ঞের নিকট তন্নিমিত্ত আমরা ক্ষমাপ্রার্থী রহিলাম

একটী গীত আমাদের স্মরণ হইয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এবার তাহার অর্থ করিতে চেষ্টা পাইব না, গীতটী এতই সহজ যে নিতান্ত অরসিক ব্যক্তিরও রসগ্রহ হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। আমরা এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতটীর ন্যায় এ গীতটিও মৃত্যুকালীন রাধার উক্তি।

কইও কানুরে সই কইও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রহিল এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন॥

কীর্ত্তনের গীতমাত্রই যে এইরূপ রসপূর্ণ এমত নহে, কীর্ত্তনের রচয়িতা মাত্রই যে কবি তাহাও নহে। এক্ষণকার "বাদনদারের" ন্যায় ইতর লোকেও অনেক কীর্ত্তন "বাঁধিয়া" গিয়াছে, সেই সকল অপকৃষ্ট গীত বৈষ্ণবেরা যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক্ষণে ভক্তিরস অধিক, কাব্য রস অল্প। কোন্ গীতটী ভাল কোন্ গীতটি মন্দ, তাহা বিচার করা বোধ হয় তাহাদের বড় আর সাধ্য নাই। কীর্ত্তন যাহাদের ব্যবসা তাহাদের ত কথাই নাই, শ্রোতা যে গীতে প্রশংসা করেন, তাহারা সেই গীত ভাল বিবেচনা করে। তাহাদের নিজের রুচি শ্রোতাদিগের ন্যায় অপকৃষ্ট। পদকল্পলতিকা যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি আরও অপকৃষ্ট। বটতলার এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, কীর্ত্তন তথায় যাইয়া "কেতাবওয়ালা" দিগের গুণে অস্পর্শনীয় হইয়া আসিয়াছে। সংগ্রহকারেরা রসপূর্ণ গীত মাত্রই প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে অতি অপকৃষ্ট পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তথাপি পদকল্পলতিকায় যাহা পাওয়া যায়, মুদ্রাঙ্কিত আর কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না, আমরা যে গীত কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও পদকল্পলতিকায় আছে।

কণ্ঠমালা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়া রামদাস সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বিলম্বে অতি অন্যমনস্কে আপন কুটীর সম্মুখে আসিলেন। স্ত্রীহত্যা করিয়াছেন বলিয়া অন্যমনস্ক নহেন; শৈলকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করিবার সময় পশ্চাতে কে চীৎকার করিয়াছিল, এই চিন্তায় তিনি

অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। যেই চীৎকার করুক তাঁহার একবার বোধ হইয়াছিল সে ব্যক্তি যেন পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া শৈলের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিয়াছে, কেন না সেই সময় শুভ্রবর্ণ কি এক পদার্থ বিদ্যুদ্বৎ পশ্চাৎ হইতে ছুটিতে দেখিয়াছিলেন, আর তাহার বেগতাড়িত বাতাস সন্ন্যাসীর অঙ্গে লাগিয়াছিল। এই ঘটনা তাঁহার নিশ্চয় স্মরণ নাই কেবল এক একবার সন্দেহ হইতেছিল মাত্র কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিলেন না।

সন্ন্যাসী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে স্থান হইতে শৈলকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেইদিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পর কুটীরের দ্বার মুক্ত করিলেন; কুটীরে দীপ ছিল না; অন্ধকারে তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, তথায় আর কেহ বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সত্বর উঠিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ক্ষণেক দ্বারে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আলোক জ্বালিয়া দেখিলেন, গৃহে কেহ নাই। অতএব ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া সন্ন্যাসী নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একবার হঠাৎ উঠিয়া আলোক পুনর্জ্জ্বালিত করিয়া দীপ হস্তে বহির্গত হইলেন। মোহান্তের কুটীরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মোহান্ত তাঁহাকে চাবি দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ধন কোথায় তাহা বলিয়া যান নাই, সন্ন্যাসীও তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক্ষণে সেই সন্ধানে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন প্রাচীরে, কখন হর্ম্ম্যতলে আঘাত করিয়া কিরূপ শব্দ হয় কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী অতি বিষাদিত অন্তঃকরণে দীপ হস্তে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন; আসিবার সময় আর একবার নদীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। যেস্থান হইতে শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই স্থানে দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পথে দাঁড়াইয়া, দীপালোক হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া আবার সেই দিকে চাহিলেন; তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তথায় একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে সে ব্যক্তি তাহা অনুসন্ধান করিতে আর তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল না, সেই দিকে যাইতেও আর তাঁহার বড় সাহস হইল না। কিঞ্চিৎ চঞ্চল পদবিক্ষেপে আপন কুটীরাভিমুখে গেলেন। চাঞ্চল্যে দীপ নিবিয়া গেল। এই সময় শব্দে বোধ হইল যেন কে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া নিকট দিয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দীপ জ্বালিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হর্ম্ম্যতলে জলসিক্ত ক্ষুদ্র পদচিহ্ন রহিয়াছে!

সন্ন্যাসী পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন, পদচিহ্ন দেখিয়া আর সে ভয় রহিল না। ভাবিলেন, অবশ্য কোন মনুষ্য আসিয়াছিল। কিন্তু জলের চিহ্ন দেখিয়া কিছু সন্দেহ হইল। সন্ন্যাসী আবার বহির্গত হইয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল; যে স্থান হইতে শৈলকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই স্থানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। নদী অতি গভীর গর্জ্জন করিতেছে যেন অতি রাগভরে কাহাকে তিরস্কার করিতেছে। সন্ন্যাসী ফিরিলেন; ফিরিবার সময় যত দূর দেখা যায় একবার নদীকূল নিরীক্ষণ করিলেন। কোথায়ও শবভুক্‌পক্ষী কি কুক্কুরের জনতা দেখিতে

পাইলেন না। সন্ন্যাসী শেষে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে শৈল রক্ষিত হইয়াছিল সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিলেন। তাহার পর কি মনে ভাবিয়া যে ঘরে মাধবী রক্ষিতা হইয়াছিল সেই ঘরের দিকে চলিলেন। হঠাৎ দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; দ্বার খোলা রহিয়াছে। দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখেন, তথায় মাধবী নাই, মাধবী পলাইয়াছে। সন্ন্যাসীর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। পূর্ব্ব দিন যখন মোহান্ত তাঁহার হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সন্ন্যাসীর সুখের আর সীমা ছিল না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের আপনাকে একমাত্র অধিকারী জানিয়া মাধবীকে বিবাহ করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন; মাধবী সুন্দরী, সতী, নম্র-স্বভাবা, আবার অতি প্রধান কুলোদ্ভবা; মাধবী স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্নবিশেষ। নর্ত্তকী বলিয়া তাহার একমাত্র কলঙ্ক কিন্তু মাধবী কখন নৃত্য করে নাই; মাধবীর পিতৃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহারাজ তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন, সে সকল কথা সন্ন্যাসী জানিতেন। অতএব তাহাকে বিবাহ করিবার কোন বাধাই ছিল না। সন্ন্যাসী ভাবিয়াছিলেন মাধবী দেবদুর্ল্লভা, মাধবী ঘরণী না হইলে ঐশ্বর্য্য বৃথা। পূর্ব্বরাত্রে সন্ন্যাসী বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে মাধবী কোন উত্তর দেয় নাই, কেবল নতশিরে মাথার কাপড় টানিয়া মুখাবরণ করিয়াছিল। সন্ন্যাসী তাহাই সম্মতির চিহ্ন বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে যখন চলিয়া যান, তখন দ্বাররুদ্ধ করিয়া যাইতে তাঁহার স্মরণ হয় নাই। মাধবী এই সুযোগে পলাইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে, দ্বার মুক্ত ছিল বলিয়াই মাধবী পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব দ্বারের প্রতি অতি কঠোর

দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু সেই দৃষ্টির তীব্রতা লৌহদ্বার কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ক ভ্রূকেশ নানা ভঙ্গীতে অবনত হইয়া চক্ষুকূপদ্বয় প্রায় আবরণ করিয়াছে। তাহার অন্তরাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিপাত দেখিলে বোধ হয় যেন লতাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র গর্ত্ত হইতে কোন হিংস্র কীট বিষক্ষেপ করিতেছে। মাধবী এই দৃষ্টিতে ভয় পাইত; শৈল এই দৃষ্টিতে হাসিত।

মুসলমান দারগা শম্ভু কয়েদীর তত্ত্ব লইতে রাত্রে আসিবার কথা ছিল কিন্তু আসিল না। সন্ন্যাসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিলেন, শেষ আপন কুটীরে যাইয়া শয়ন করিলেন। পরে কয়েক দিন সন্ন্যাসী অতি বিষাদিতান্তকরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধনাগারের চাবি পাইয়াছেন কিন্তু ধন পান নাই, মাধবী পলাইয়াছে, শম্ভু কয়েদী ধরা পড়ে নাই। এইসকল ঘটনা সন্ন্যাসীর বিষণ্ণতার কারণ। রামদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, সম্পূর্ণ সুখ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ দিবস পরে এক দিবস প্রাতে নুরগ্রামবাসীরা সুসজ্জ হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তথায় বিলাস বাবুর বিচার হইবে বড় সমারোহ। পথিমধ্যে দলে দলে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বিলাসের নিশ্চয় ফাঁসি হইবে।" কেহ বলিতে লাগিল "ফাঁসি কি মুখের কথা! বিলাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?" প্রথম বক্তা বলিল, "প্রমাণ অবশ্যই আছে, প্রমাণ না থাকিলে কি মেজেষ্টার সাহেব দায়রা সোপর্দ্দ করেন। বিলাস আপনিই স্বীকার করিয়াছে আবার চৌকীদার খুন করিতে দেখিয়াছে।" দ্বিতীয় বক্তা বলিল,

"চৌকীদার সহস্রবার দেখুক, প্রমাণ না থাকিলে কিছুই হইবে না; এক্ষণকার আইন বড় শক্ত।" প্রথম বক্তা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি কি মূর্খ! আবার কি প্রমাণ চাও? তবে প্রমাণ কাহারে বলে তাহা জান না।" দ্বিতীয় বক্তা আরও ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! আমি মূর্খ? আমি প্রমাণ চিনি না? বল দেখি তুমি কয়জন মোক্তারের বাটী গিয়াছ? কয়জন মোক্তারকে চেন? আমার অপেক্ষা তুমি প্রমাণ বুঝিয়া থাক? প্রমাণ মুখের কথা আর কি? অমনি বলিলেই হয় না; বাড়ী বসিয়া অন্নধ্বংসাইয়া প্রমাণ শিক্ষা হয় না, মোক্তারদের সহিত আলাপ করিলে তবে প্রমাণ শিক্ষা হয়,অল্পে হয় না।"

এই সময় আর এক দলের মধ্যে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, বিনোদকে শাবল ফেলিয়া মারিয়াছে। কেহ বলিতেছে মুখে বালিষ চাপিয়া মারিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া আর সকলে যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিল। সকলেই ক্ষণেক কাল পরস্পর আপনাপন মনে বিনোদের কথা, শৈলের কথা, আপনার স্ত্রী বা কন্যার কথা, বা অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একটি বালক মাতৃদত্ত দুইটি পয়সা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছিল। সকলে নিরস্ত হইলে বালকটি আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা,এই পয়সায় কি কিনিব?" পিতা উত্তর করিলেন, "সন্দেশ কিনিও।" বালক "আচ্ছা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। যে বক্তার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, যাঁহার সহিত মোক্তারদিগের আলাপ আছে, যিনি প্রমাণ কাহারে বলে ভাল জানেন, বালকটি তাঁহারই পুত্র। বালকটি আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"বাবা! দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না?" পিতা বলিলেন, "না" পুত্র পুনরায় অতি স্নেহভাবে বলিল, "বিলাস বাবুর ফাঁসি হবে, বাবা, তোমার ফাঁসি কবে হবে?" বালকের এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিল। পিতা অপ্রতিভ ও রাগান্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকটি কি অপরাধ করিয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গীরা আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা করিলে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল। পিতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া ফাঁসি দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালককে দুই একবার ডাকিয়া বালকের পিতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সকলেই ভাবিলেন বালক অধিক দূর যাইবে না শীঘ্রই ফিরিবে। কিন্তু বালক আর ফিরিল না। কতক দূর হইতে সকলে দেখিলেন বালক একটি স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে উঠিয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি যে কে, তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিলেন না; সে বিষয়ে আর কেহ বড় অনুসন্ধানও করিলেন না; সকলেই নগরাভিমুখে চলিলেন। নগরের নিকটে যাইয়া দেখেন সেই স্ত্রীলোকটি অতি দ্রুত পদবিক্ষেপে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। চকিতের মধ্যে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি যুবতী কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী; শীর্ণা অথচ বলিষ্ঠা; কেহ তাঁহারে চিনিতে পারিলেন না। বালকের পিতা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সন্তানকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" অবগুণ্ঠনবতী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। পিতা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। সকলেই তাঁহারে বলিল চিন্তা নাই, যুবতী পরিচিতা না হইলে তোমার বালক উহার ক্রোড়ে যায় নাই।

সে একাই বাটী ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। পিতাও তাহা বুঝিলেন। শেষে সকলে একত্রে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিচার তখন আরম্ভ হইয়াছে। সমুদায় সাক্ষীর "জবানবন্দী" হইয়া গিয়াছে। বিলাস বাবু যোড় করে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে কনেষ্টেবলগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামবাসীরা বহু যত্ন করিতে লাগিল কিন্তু লোকের জনতাপ্রযুক্ত কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু সেই লোকারণ্য মধ্যে অবগুণ্ঠনবতীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। জজ সাহেবও পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রতি চাহিতেছিলেন।

সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে, বিলাস বাবুকে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" বিলাস বাবু একবার বাম পদে একবার দক্ষিণ পদে ভর দিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ অস্থির হইলেন কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। জনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা জজ সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিনোদকে খুন করিয়াছ?" বিলাস বাবু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া জজ সাহেবের দিকে চাহিলেন, কিন্তু জজ সাহেব তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। জজ সাহেব ভাবিলেন এব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী তাহাই আমার দিকে চাহিতে পারিতেছে না।

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিনোদ বাবুকে হত্যা করিয়াছ?"

বিলাস প্রথমতঃ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন, পরক্ষণে স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হুঁ খুন করিয়াছি—অন্ধকার রাত্রে খুন করিয়াছি।"

জজ। কিরূপে খুন করিলে?

বি। যে রূপে লোকে খুন করে অর্থাৎ অর্থাৎ—

জজ। কোন অস্ত্রদ্বারা খুন করিয়াছিলে?

বি। না অস্ত্র নহে—হাঁ অস্ত্র বই কি—শাবল দ্বারা—

জজ। শাবল দ্বারা কোথা আঘাত করিয়াছিলে?

বি। শাবল দ্বারা কোথায়ও আঘাত করি নাই।

জজ। তবে কিরূপে খুন করিলে?

বি। পদদ্বারা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম।

জজ। তবে শাবলের কথা কেন বলিতেছিলে?

বি। শাবল আমার হাতে ছিল।

জজ। তোমায় তৎকালে কেহ দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল।

জজ। কে দেখিয়াছিল?

বি। তাহা জানি না।

জজ। এই চৌকিদার দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল, ঐ ত আমায় বাঁচায়?

জজ। কেন, তোমার কি হইয়াছিল?

বি। আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

জজ। কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?

বি। ভয়ে।

জজ। কিসে ভয় পাইয়াছিলে?

বি। প্রাচীরের উপর চৌকিদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।

জজ সাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সময় অবগুণ্ঠনবতী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আপন মুখাবরণ মুক্ত করিয়া অতি পরিষ্কার স্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতার এব্যক্তি

বাতুল, ইহার কোন কথাই বিশ্বাস করিবেন না, খুন আমি করিয়াছি।”

বিলাস বলিয়া উঠিল “হাঁ হাঁ খুন এই করিয়াছে এই শৈল।” নাম মাত্রে সকলের দৃষ্টি শৈলের উপর পড়িল; শৈল পাণ্ডুবর্ণা, ভয়ঙ্করা, শীর্ণা, সুন্দরী। শৈলের পরিচয় পূর্ব্বে রাষ্ট হইয়াছিল, সেই রাক্ষসীকে দেখিবার নিমিত্ত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। শত শত লোক তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, শৈল দৃক্‌পাতও করিল না। কনেষ্টবল দিগের তাড়নায় কলরব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, শৈল পূর্ব্বমত আবার বলিল, “খুন আমি করিয়াছি, আমার প্রতি ফাঁসি আজ্ঞা হউক।”

জজ সাহেব একাল পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে শৈলের প্রতি চাহিয়াছিলেন। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে বহু দিবসাবধি বাস করিয়া বিবর্ণা হইয়াগিয়াছিল। জজ সাহেব সেরূপ বর্ণ কখন মনুষ্যের দেখেন নাই। মনুষ্যের এই নূতন বর্ণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। শৈলের পুনরুক্তি শুনিয়া মোকদ্দমার দিকে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

জজ। কে তুমি, তোমার নাম কি?

শৈ। আমার নাম শৈল দেবী।

জজ। যিনি হত হইয়াছেন তিনি তোমার কে ছিলেন?

শৈ। আমার স্বামী ছিলেন!

জজ। তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে?

শৈ। আমি খুন করিয়াছি।

“মিথ্যা কথা! আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি” বলিয়া আর একব্যক্তি জজ সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, “আমাদের বিনোদ!” আবার বিচার গৃহে মহাকলরব পড়িয়াগেল। কেহ কাহারও নিবারণ শুনে না।

আগন্তুক ব্যক্তির নাম, ধাম পরিচয় লইয়া জজ সাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন। এ মিথ্যা মোকদ্দমা কেন উপস্থিত হইল তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। বিলাস বাবুকে খালাস দিবার সময় জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত এত কেন ব্যস্ত হইয়াছিলে?”

বি। ফাঁসিতে আমার বড় ভয়।

জজ। তবে কেন খুন করিয়াছি বলিতেছিলে?

বি। তাহা আমি জানি না।

এইরূপ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখেন শৈল সেখানে আর নাই।

মোকদ্দামা শেষ হইয়া গেলে বিলাস বাবুকে সঙ্গে লইয়া নুরগ্রামবাসীরা অপরাহ্নে আপনাদিগের গ্রামাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময় মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী বলিল, “বুঝি শৈল আসিতেছে।” সকলেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল সত্যই শৈল আসিতেছে। বিলাস বাবু সে দিকে চাহিলেন না। শৈল আর অবগুণ্ঠনবতী নাই, শৈল ফণিনীর ন্যায় সদর্পে ক্রমে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল; একবার তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিল না।

দেখিতে দেখিতে শৈল দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় নদীর কূলে উপস্থিত হইয়া একটি নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ করিল। আর একটি স্ত্রীলোক কক্ষান্তরে গৃহকার্য্য করিতেছিল; শৈলকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যজন হস্তে অতি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শৈল শয্যায় বসিয়া স্থিরনেত্রে দীপশিখা দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় গিয়াছিলে?” শৈল দীপ দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, “নগরে—সাহেবের কাছে।”,

সঙ্গিনী। কেন?

শৈ। মরিবার নিমিত্ত।

স। ও সকল কথা মুখে আনিও না, কোথায় গিয়াছিলে?

শৈ। আমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত জজ সাহেবের কাছারিতে গিয়াছিলাম; শুনিয়াছিলাম অদ্য একজনের ফাঁসি হবে। তাহাই সেখানে গিয়া বলিলাম—

স। কি বলিলে?

শৈ। যাহা বলিবার।

স। তোমার বলিবার কি ছিল?

শৈ। বলিলাম, "আমি খুন করিয়াছি।"

স। তাহার পর?

শৈ। আর একজন বলিল, হাঁ শৈলই এই খুন করিয়াছে।

স। তাহার পর?

শৈ। তাহার পর আর যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তুমি দেবতা চিনিতে পার?

স। কে দেবতা দেখেছে যে চিনিতে পারিবে।

শৈ। লোকে বলে দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।

স। সেকালে তাহা হইত, এখন আর সেকাল নাই।

শৈল অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কালসাপ কি উদ্ধার হয়?"

স। সাপের আবার উদ্ধার কি?

শৈ। কেন? তুমি কালীয়দমন যাত্রায় শুন নাই?

স। শুনেছি, দেবতায় কি না পারেন। কিন্তু সেকালে দেবতারা সকল করিতেন।

শৈ। অদ্যাপিও করেন, অনেক মনুষ্য মানুষ নহে, দেবতা।

প। হাঁ, মানুষ নাকি দেবতা!

শৈ। তবে কি?

শৈল এই কথাটি চীৎকার করিয়া বলিল। সঙ্গিনী মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, শৈলের চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; অতি বিকটভাবে দীপের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্গিনী অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল, ভগিনি, কি দেখিতেছ? অমন করিয়া রহিলে কেন? ছি! দিদি মুখ ফিরাও।" সঙ্গিনী দেখিল শৈল কোন কথাই শুনিতেছে না, চক্ষের পলকও ফেলিতেছে না; চক্ষুর ক্রমে বিকৃতি হইতেছে। সঙ্গিনী অতি ভীতা হইয়া উঠিয়া গেল, কক্ষান্তরে গিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে শৈলের ঘরে অতি উচ্চ হাসি শুনিয়া সঙ্গিনী আবার দৌড়িয়া আসিল; দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে শৈল শয়ন করিতেছে। সঙ্গিনী চক্ষের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ?"

শৈ। বেশ আছি।

স। বাতাস দিব?

শৈ। দেও।

সঙ্গিনী নিঃশব্দে বাতাস দিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন সঙ্গিনী পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী।

কাতরা ময়ূরী।

১

নূতন বরষাগমে বিমল গগন,
নব-নীল-মেঘ-দলে ঢাকিত যখন,
দেখেছি পূরবকালে, কাল-জল-ধর-কোলে,
সোহাগে চপলাধনী করিত নর্ত্তন;
তুমিও শিখিনী কত নাচিতে তখন।

২

মাতিয়া প্রেমের ভরে কতই নাচিতে,
ললিত-নিকুঞ্জ-লতা চরণে দলিতে,
আমোদে পেকম খুলে, গ্রীবা তুলে হেলে দুলে,
উলটি চন্দ্রক-মালা ঢলিয়া পড়িতে,
ফিরে ঘুরে কাল-মেঘ আবার দেখিতে।

৩

হায়রে কলাপ-বতি বন বিলাসিনি!
বল বল এবে তুমি কেনরে মলিনী?
কি হ'য়েছে? কোন্ দুখে—আছরে বিরস মুখে?
হারা'য়েছ কোন্ নিধি? বল বল শুনি,
কেন অনশনে ক্ষয় করিছ পরাণি?

৪

ঐ দেখ সেই মেঘ আকাশের কোলে,
সুনীল-গভীর-বেশে ফিরে দলে দলে;
নবীন-নীরদ-বুকে থাকিয়া পরম সুখে,
সেই ত চপলা বধূ লুকায়ে বিরলে,
থেকে থেকে উকি দিয়া জগত উজলে!

৫

সেই মেঘ সেই তুমি সকলি ত তাই,
তবে বল দেখি, তব কি ছিল কি নাই?
অথবা বুঝেছি পাখী যে কারণে ঝরে আঁখি,
ও মেঘে তোমার আর অধিকার নাই!
তাই বলে উদাসিনী হ'য়েছ সদাই,

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিশ্র।

ভ্রমর

মাসিক পত্র।

আষাঢ়, ১২৮২।] [১৫ সংখ্যা।

আমি।

আষাঢ় মাস—নিদাঘের অসহ্য যন্ত্রণায় গৃহহইতে বহির্গত হইবার সামর্থ্য অভাবে, আমার পৈতৃক একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি ভগ্ন তালবৃন্তসহায়ে, একখানি চৌকীর উপর শয়ন করতঃ কিছুকাল নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিলাম। ভক্তবৎসলা দেবী আমার ভক্তিমত্তায় প্রীতা হইয়া, পুত্রবাৎসল্যে আমার ক্লেশ দূরীকরণার্থ আমাকে ক্রোড়ে ধারণ জন্য আমার শয্যোপরি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন কিন্তু আমার সুকোমল সুকৃষ্ণ শয্যার সুগন্ধেই হউক, বা তন্নিবাসী কীটাদির মধুর সম্ভাষণেই হউক, অথবা নিদাঘ হইতে শঙ্কা প্রযুক্তই হউক, অগত্যা আমার নিকট হইতে অপসৃতা হইয়া অন্যত্র স্থানান্বেষণে তৎপরা হইলেন। আমি দেবীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে কিছুকাল তালবৃন্তখানির সহিত প্রণয় করতঃ একবার মনে মনে চিন্তা করিলাম "এক্ষণে আমি আর কি করিতে পারি?" তখন "আমি" এই কথার হঠাৎ মনঃ-

ক্ষেত্রে বিকাশ মাত্রই আমার বুদ্ধিহ্রদ তৎক্ষণাৎ একটী অভূতপূর্ব্ব তর্কতরঙ্গে আলোড়িত হইল। তখন আমি, আমিতত্ত্বের মীমাংসায় এককালে অভিনিবিষ্ট হইলাম। আমার সুমার্জ্জিত বুদ্ধি কিছুকাল দর্শনশাস্ত্রে নিয়মিত হইলে, দক্ষিণ হস্তভূষণ অঙ্গুলিগুলি আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহারা একসময়েই সকলে কণ্ডুয়িত হইল। আমি তখন অগত্যা লেখনীধারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিকণ্ডুয়ন বিনোদন ও আমি তত্ত্বের নিরাকরণ উভয়কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সংসারসমুদ্রে প্লবমান ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ মনুষ্যবৃন্দের মধ্যে আমি এই শব্দটী সকলেরই নিকট আদৃত। এসংসারে কি ধনী কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি সুবুদ্ধি কি নির্ব্বোধ, কি রাজা কিপ্রজা, সকলেরই ধারণা যে, আমিই সংসারে একজন, সকলেই জানেন অন্যাপেক্ষা আমি কোন না কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। যিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজৌপাধিক তিনি জানেন আমি হর্ত্তা, আমি কর্ত্তা, আমি পাতা, আতি বিধাতা; ভোগ্য সকলই আমার, ইহলোকে আমিই একা ভোক্তা; আমি সকলেরই উপাস্য, ভূলোক আমার উপাসক মাত্র। মহাত্মা মন্ত্রীমহাশয় জানেন, আমারই সুবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া এই রাজ্য পরিপালিতা হইতেছে; এই কোটী২ জীবের আমি তত্ত্বাবধারক, আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির অবিষয়ীভূত এ ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নহে, ইহলোকে আমিই এক জন। এই যে সিংহাসনারূঢ়, ছত্রদণ্ডধারী, যাঁহাকে লোকে প্রধান পুরুষ জ্ঞান করিয়া থাকে ইনি কেবল আমার ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। আমি ইচ্ছানুসারে ইঁহাকে নাচাইতেছি, ফিরাইতেছি, ঘুরাইতেছি, উঠাইতেছি, বসাইতেছি, শোয়াইতেছি; যখন ইচ্ছা করিব তখনই কল বন্ধ করিয়া কলের পুতুল কর্দ্দমে নিক্ষেপ করিব। মদোদ্ধত, মহাবীর, অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ প্রয়োগ সংহারবেত্তা, রণদক্ষ সেনাপতি মহাশয় জানেন আমারই বাহুবলরক্ষিত হইয়া এই বিশাল রাজ্য মনুষ্য বাসোপযোগী হইতেছে। আমি না থাকিলে রাজা প্রজা এই নাম কোথায় অন্তর্হিত হইত। এই সমাজসাগরে আমিই একটী ভাসমান ভেলা স্বরূপ, আমাকে অবলম্বন করিয়াই সকলে এই অকূল সাগরের কূল প্রাপ্ত হইতেছে অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ। আবার বিচার কর্ত্তা কি দণ্ডপ্রণেতা মহাশয় জানেন আমিই সমাজের মূলভিত্তি; আমি লোকের ধন মানের রক্ষক, আমারপ্রযুক্ত নীতি উদ্ভাবিত না হইলে সংসারের কোন মঙ্গলই সাধিত হইত না। আতপতণ্ডুলভোজী দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানেন, "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন" সেও আমি। ঐরূপ পুরোহিত জানেন গ্রহের বিঘ্নবিনাশক আমি। অপর, কৃষক ভাবে রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, সকলের অন্নদাতা আমি। জোলা ভাবে, লোকে অন্নদাতাই হউন, আর যাহাই হউন, দুনিয়ার আব্রুদার আমি অর্থাৎ এজগতে আমিই লজ্জানিবারণ। আর চৌকিদারের ত কথাই নাই, তাঁহার স্ত্রী সমাজের প্রধান আমি। এইপ্রকারে রাজা হইতে ক্ষুদ্র প্রজা কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই জানেন সংসারে আমিই একজন।

এই আমি শুদ্ধ একালে আমাদিগেরই মধ্যে প্রচলিত নহেন। ইনি সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই আশ্রয় করিয়াছেন। কোন২ স্থলে কোন কোন মহাত্মার ব্যবহৃত আমি শব্দ আবহমান কাল ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়া আদরিত হইতেও দেখা যাইতেছে। মহাভারতে অর্জ্জুনকে উপদেশকালীন শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্ব ঘটেই আমি" এই বাক্য প্রতিপাদনার্থ যে বাক্য গুলিন বলিয়াছেন, তাহা ইহলোকে অদ্যাপি ভগবদ্গীতাখ্যা ধারণানন্তর ভারতোজ্জ্বল করিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত মধ্যেও আমি শব্দের অভাব

নাই; এ সকলে কোথাও "সোঽহং" কোথাও "শিবোঽহং" ইত্যাদি মূর্ত্তিতে আমি বিরাজমান। পুরাণকর্ত্তা বেদব্যাসও "আমিই সাক্ষাৎ নারায়ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবও সেদিন নবদ্বীপে ভক্তমহলে "মুঞিসেই" বলিয়া প্রেমের ধ্বজা উড়াইয়াছেন। আর২ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও আমি ছাড়া নহে; তাই বলিতেছি এই আমি কেবল আমাদের আমি নহে, ইহা সকল সময়ে সকলেরই আমি।

সময়ান্তরে এই আমিতে অবস্থান্তরও সংঘটিত হইয়াছে। যেদিন বিখ্যাত ভ্রমণকারী কলম্বসের মনে "আট্‌লাণ্টিকের পার আছে" উদিত হইয়া, কথা রাজসমক্ষে প্রস্তাবিত হইলে তিনি উপহাসভাজন হন, সেদিন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, আমি ইহা আবিষ্কার করিব, সেই এক আমি। ব্রাহ্মণের অত্যাচার-পীড়িত ভারতবাসীদিগকে অবলোকানন্তর বৌদ্ধদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "ইহাদের দুঃখবিমোচন আমি করিব" সেও এক আমি। আর একবার পরশুরাম বলিয়াছিলেন, পৃথিবী আমি নিঃক্ষত্রিয়া করিব, সেও এক আমি। এইরূপ নানাস্থানে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজিত নানা প্রকার আমি।

বর্ত্তমান সময়ে আমরাও আমি মন্ত্রের মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করি। আমাদিগের মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিতে করিতে যবন কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রান্তের সম্ভাবনা দেখিয়া ভবিষ্যদ্বেত্তাদিগের নিকট "যবনেরা বঙ্গ অধিকার করিবে" শ্রবণ মাত্রই চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া উচ্চরবে মহাপুরুষের ন্যায় বলিলেন যে, "আমি বৃদ্ধ, আমি কি করিব, আমার যুদ্ধোদ্যোগ সম্ভবে না, আমি পলায়ন করি।" তাহাও এক আমি। যখন সপ্তদশ যবন কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত শুনিয়া, রাজার পলায়নের

পর পাত্র মিত্র সকলেই তৎপথাবলম্বী হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন যে, "অগ্রে আমি অগ্রে আমি" তাহাও এক প্রকার আমি। আর এই যে বঙ্গীয় যুবক মহোদ্যমের সহিত একটি কর্ম্মের প্রার্থনায় কহিতেছেন "আমি বি এ, আমি এম এ, আমি এত সার্ভিস করিয়াছি, আমি এত কাগজ লিখিতে সক্ষম, আমি এত পথ অতিবাহনে পটু," ইহাও অসামান্য আমি। আমাদিগের বর্ত্তমান মহাপুরুষের মধ্যে কেহ কেহ কোন উপায়ে রাজপুরুষের নিকট প্রাপ্ত ভারত নক্ষত্র, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, আখ্যা ধারণানন্তর মনে করেন যে, "আমি" অসাধারণ সেও এক আমি। আর কেহ কেহ কোন সুযোগে কোন প্রধান লোকের সহিত একাসনে উপবেশন বা একত্রে দুই চারিপদ ভ্রমণানন্তর মনে করেন যে, "কৃতকৃতার্থ আমি" তাহাও এক আমি। কেহ কেহবা কোন উপায়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কোন ইংরেজ স্বাক্ষরিত, দুই চারি অঙ্গুলি পরিমিত, একখানি কাগজ বাক্সবন্দী করিয়া মনে ভাবেন "ভারতমধ্যে একজন আমি" তাহাও আমি। কোন কোন মহাত্মা কষ্টে সৃষ্টে অন্যলিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলনানন্তর একটি প্রবন্ধ সংবাদ পত্র মধ্যে প্রকাশ করণানন্তর মনে করেন "মহাপুরুষ আমি" তাহাও আমি। এতদ্ব্যতীত কেহ সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া আমি, কেহ নাটক লিখিয়া আমি, কেহ কাহাকে গালি দিয়া আমি, কেহ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া আমি, কেহ দুই চারি পাত ইংরেজি পড়িয়া আমি, কেহ না পড়িয়া তাহা ছুঁইয়াই আমি, কেহবা কিছু নাকরিয়া কেবল কাহারও প্রসাদী দুই চারি গ্লাশ ব্রাণ্ডী টানিয়াই আমি। আরও নানাপ্রকার আমি আছে। তন্মধ্যে এইযে বেলা আড়াই প্রহরের সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লেখনী হস্তে বামকরতলোপরি বাম গণ্ড স্থাপিত করণানন্তর কি লিখিব কি লিখিব মনে ভাবিতে

ভাবিতে বৃথা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছি ইহাও এক অপূর্ব্ব আমি। অদ্য আর অধিক আমিতে কাজনাই; কেবল আমার-মত আমি দিগকে আমি আর একটি কথা বলিয়া বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া, আমার সুরঞ্জিত হংসপুচ্ছ লেখনীর বিশ্রাম-সাধনে প্রবৃত্ত হই।

ভাই আমির দল! তোমরা আমি আমি অভিমান কর তাহাতে হানি নাই, এবং কেহ তাহাতে অসন্তুষ্টও নহে। কিন্তু ভাই! এই আমি আর এক প্রকারে ভাব দেখি—ভাব দেখি পরোপকারে আমি একজন। যখন দেখিতে পাও তোমার সম্মুখে কোন ক্ষুধাতুর অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া তোমার নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রর্থনা করিতেছে,তুমি তখন বিনা কটাক্ষে সেস্থান পরিত্যাগ না করিয়া,ভাব দেখি যে, আমি ইহাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করি, ভাব দেখি যে একাত্মস্বরূপ সমদুঃখসুখ এ—এবং আমি। যখন দেখিতে পাও কোন আশ্রয়হীন,রুগ্ন পথপ্রান্তে নিপতিত হইয়া করুণ স্বরে,পরি-দেবিতাক্ষরে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, তখন ভাব দেখি, আমি সাধ্যমত ইহার সাহায্য করি, ভাব দেখি ইহার শুশ্রূষাবিধান করি, ভাব দেখি একাত্মস্বরূপ সমদুঃখ সুখ এ—এবং আমি। যখন দেখিবে দেশমধ্যে হীনাবস্থগণ উন্নত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উত্যক্ত, পীড়িত, অপহৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দীনভাবে উপায়ান্তর বিরহে ক্ষুণ্ণমনে বিলাপপরায়ণ হইতেছে, তখন একবার তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাহাদের দুঃখ নিবারণে বদ্ধপরি-কর হইয়া, ভাব দেখি যে, একাত্মস্বরূপ সমদুঃখ সুখ এ—এবং আমি। হে আমিভাবাপন্নগণ! এইরূপ আমিই আমি; এ আমিতে কাহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আমি বিদ্বান্, আমি বুদ্ধিমান্, আমি কৃতকর্ম্মা, আমি ক্ষণজন্মা, আমি মান্য, আমি ধন্য, এরূপ আমি আমি নহে।

আর একটি কথা। ভাই! সকল কার্য্যেই আমি আমি কথাটী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভাই, ইহা অপেক্ষা আর একটি বড় ভাল কথা আছে। কথাটী তোমার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু কথাটী বড় মিষ্ট। আর তোমার ব্যবহৃত আমি কথার সহিত প্রভেদও অল্প। এক বার আমি এই কথার স্থলে আমরা উচ্চারণ করিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি কত সুখী হইবে। একবার উচ্চরবে বল দেখি আমরা বাঙ্গালি, আমরা বঙ্গদেশ বাসী, আমরা সাহসহীন, তেজোহীন, বিদ্যাহীন, আমরা বিদেশীয়ের উপহাসভাজন, আইস আমরা আমাদিগের কলঙ্ক দূরীভূত করি, আইস বাঙ্গালি নাম পৃথিবীতে আদরণীয় করি, আইস ভাই ভাই জ্ঞান করিতে শিখি, আইস মায়ের সুপুত্র হই, আইস মায়ের মুখোজ্জ্বল করি, আইস আমি ছাড়িয়া সকলে একবার আমরা বলিতে শিখি।

কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তা-নের প্রতি জনক জননীর স্নেহ, নায়ক নায়িকার বিশুদ্ধ প্রণয়, সখিত্ব, প্রভৃতি সকলই পর্য্যায়ক্রমে তাহাতে বর্ণিত আছে। তাহা একবার শুনিলেই অনেককে অশ্রুপাত করিতে হয়। যেমন কীর্ত্তনের কবিত্বশক্তি অতুল্য, তদ্রূপ কীর্ত্তনের সুরও অতুল্য। যদি কীর্ত্তনের গীত না গাইয়া শুদ্ধ সুর গাওয়া যায়, তাহাহইলেও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবার তাহাতে যদি কথা যুক্ত করিয়া গাওয়া যায় তাহাহইলে ত কথাই নাই। আপনি যে কথা সর্ব্বদা ঘরে বাহিরে শুনিতেছেন, তাহা যদি

কীর্ত্তনসুরে গীত হয়,তবে সে কথা যে ভাবে সেই সুরে গীতসুরে হইবে,সেই ভাব আপনার হৃদয়ে অবিকল চিত্রিত করিবে। কবিত্বের ক্ষমতা এই যে,যখন যেমন ভাবে ইহা লিখিত হয়, অবিকল সেই ভাব পাঠক কিম্বা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে চিত্রিত করে। এই ক্ষমতা যতদূর কীর্ত্তনে দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আধুনিক অন্য কোন পুস্তকে কিম্বা গীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরেরও কার্য্য কবিত্বের ন্যায়। কবিত্বশক্তি যেমন যে ভাবে লিখিত হয়, পাঠকের মনে তদনুরূপ ভাব অঙ্কিত করে, সুরও তদ্রূপ যে ভাবে গীত হয় শ্রোতৃগণের মনে তদনুরূপ ভাব উদ্দীপন করে। আবার মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার সহিত স্বতন্ত্র সুর গীত হয়। মন যখন আনন্দিত, সে সময়ের সুর স্বতন্ত্র; যখন দুঃখিত, সে সময়ের সুর স্বতন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক গীতপ্রণেতৃগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আনন্দিতাবস্থার সুর দুঃখিতাবস্থায় দুঃখিতাবস্থার সুর আনন্দিতাবস্থায় গান করায় সে গীত তাহাতে কবিত্ব থাকিলেও বিষময় বলিয়া বোধ হয়। কীর্ত্তন গীতপ্রণেতৃগণ সুবিবেচক ও মার্জ্জিতরুচি ছিলেন। তজ্জন্য কীর্ত্তনে উক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

"সখীরে" এ কথাটি আপনি কতবার শুনিয়াছেন, আর শুনিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু ইহা কীর্ত্তন সুরে রোদনাবস্থার গীতে গীত হইলে আপনি অবশ্য কাঁদিবেন। প্রথমে না কাঁদিলেও আপনার রোদনের উদ্যম হইবে, পরে তাহাতে বাক্যসংযোজনা হইলে ("সখীরে সো মুখ চাঁদ") আপনার হৃদয় উছলিয়া উঠিবে—হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিতে থাকিবে—শরীরের মাংসপেশী, অস্থি, শিরা সকল মধ্যে "সখীরে সো মুখ চাঁদ" ধ্বনিত হইবে। আবার তাহাতে বাক্যসংযোগ হইলে আপনার মনের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হইবে; আপনাপনি নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু বাহির হইবে।

যতরূপ রাগিণী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের গানের নিমিত্ত বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তৃগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তনের তাহা নহে; কীর্ত্তন যে সময় গীত হউক না কেন, যে ভাবে গীত হইবে, সেই ভাবে মন অধিক আকৃষ্ট হইবেক। আকাশ গর্জ্জিতেছে; ভ্রমর কৃষ্ণঘনক্রোড়ে চঞ্চলা খেলিতেছে; কৃষ্ণাম্বরা যামিনী; মেঘ ফাঁক করিয়া দুই একটি তারকা সুন্দরী উঁকি মারিতেছে, এ সময় কীর্ত্তন গাও; আপনার মন আকৃষ্ট হইবে। মধ্যাহ্ন সময়ে মার্ত্তণ্ড ময়ূখজাল প্রধাবিত; সূর্য্যকিরণে বসুন্ধরা হাসিতেছে; কীর্ত্তন গাও; তোমার মন আকৃষ্ট হইবে। তুমি খট্টায় নিদ্রিত; বসন্ত মরুৎ পুষ্পদাম দোলাইয়া তাহার সৌরভ তোমার নাসিকায় আনিয়া দিতেছে; যামিনী-সুষুপ্তা; এসময় কীর্ত্তন গাও; যদি সে ধ্বনি কিঞ্চিন্মাত্র তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তুমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিবে। কিন্তু উপরোল্লিখিত সময়ে অন্য কোন সুরের গান গায়িলে বোধ হয় তোমার ততদূর মিষ্ট লাগিবে না।

শোকসন্তপ্ত লোকদিগের যতদূর কীর্ত্তন ভাল লাগে এত দূর তোমার আমার ভাল লাগে না। তাহার কারণ শোকাতুর ব্যক্তিরা কাঁদিয়া তাহাদিগের শোকের শমতা করিতে ইচ্ছা করে। কীর্ত্তন কাঁদাইবার গীত, সুতরাং শোকাভিভূতের অন্তর্দ্দেশে যে শোকবহ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে, তাহার অনুরূপ সে বাহ্যিক দেখিতে পায়, দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলে। তাহার তখন অভিনেতৃদিগের দুঃখ হৃদয়ে স্পষ্ট অঙ্কিত হয়। তৎকালে কীর্ত্তন যতদূর তাহার হৃদয়গ্রাহী হয়, ততদূর তোমার আমার

হইবে না। সেই ভাব তাহার হৃদয়ে যতদূর চিত্রিত হইবে তত-দূর তোমার আমার হৃদয়ে কখনই হইবে না।

কথিত আছে কীর্ত্তনের সুর কৃষ্ণের প্রপৌত্র কর্ত্তৃক রচিত হয়, এবং মহাদেব কর্ত্তৃক গীত হয়। এই গীত শ্রবণনিমিত্ত কৈলাসে সুরগণ কৈলাসাধিপতি কর্ত্তৃক সভাতলে আহুত হন। সেই সভার মধ্যে স্বয়ং মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া গীতারম্ভ করেন। অনন্ত অমরাবতী বিধূনিত করিয়া, মন্দাকিনী উছলিয়া, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোকাদি কম্পিত করিয়া মহাদেবের সুর উঠিল। গীত শুনিয়া দেবগণ নিস্তব্ধ, ক্রমশঃ সকলেই জল হইয়া গে-লেন। স্বয়ং মহাদেবের হস্ত হইতে সপ্ততন্ত্রী বীণা খসিয়া পড়িল। রজত আসন হইতে দেবাদিদেব নিম্নে পতিত হই-লেন; রজতগিরিসন্নিভ কলেবর অচেতন; জটাভার আলুলা-য়িত; ফণিপাশবদ্ধ শার্দ্দূল চর্ম্মাম্বর খসিয়া পড়িল। কীর্ত্তন যে কতদূর মিষ্ট তাহা এই গল্প প্রমাণ করিবে।

আমরা বলিয়াছি, কীর্ত্তনে জননীর স্নেহ, নায়ক নায়িকার অনুরাগ, সখিত্ব, ইত্যাদি নানাবিধ ভাব পরিপূর্ণ মিষ্ট গীতি আছে। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে এক একটি গীত কত দূর মিষ্ট বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা কতক গুলি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জননীর স্নেহ ও সখিত্ব আধুনিক কীর্ত্তনে আছে। পুরা-কালীন কবিদিগের কীর্ত্তনে তাহা নাই। সুতরাং সে সকল গীত আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিব না। প্রথমে একটি শ্রীরাধি-কার পূর্ব্বরাগ গীত দেখুন।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥

রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেখ পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা।

আর্য্যজাতির চিত্রপট।

দেবীর বরণ।

বিজয়া দশমীর দিন কোন ভাগ্যবান্ বঙ্গবাসীর গৃহিণী আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গিরীশনন্দিনীকে বরণ করিবার নিমিত্ত চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকায় বসিলেন। আজি শ্রীশ্রীদুর্গার বিসর্জন—আজি বৎসরের মত ৺ চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার হইবে। আজি গৃহস্থের মন বৎসরের মত নিরানন্দ হইবে এই ভাবিয়া গৃহিণী নয়নের জলে ভাসমানা। ক্ষণপরে অঞ্চলের দ্বারা চক্ষুর জল মুছিয়া একতান মনে ভক্তিভাবে ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী ও পুত্রবধূও পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সকলেই কল্যাণ কামনার পর প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া দেবীর মূর্ত্তি ও চিত্রপট দেখিতে-ছেন। নন্দিনী জননীকে সম্বোধন করিয়া চাল চিত্রের পুত্তলিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল মা, ঐ যে কতকগুলি দেব-কন্যে কতকগুলি মুনিকন্যে কতকগুলি রাজকন্যের মাঝখানে

একটি দুঃখিনী মেয়ে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার শিয়রের কাছে বসে এক রাজরাণীর মত যে কে কাঁদিতেছে, ও কোন দেবতা জানিস্।

জননী—সবজানি মন দিয়ে শোন। সতী পতিনিন্দায় আপন শরীর পাত কল্যেন তবু পতি নিন্দে সহ্য কত্তে পাল্যেন না। যাঁর চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্যে দেখ্‌লি তিনি প্রসূতি, সতীর মা। আর আর দেবকন্যে মেয়ে মানুষগুলি, যারা বিরস মনে, দুঃখিত ভাবে অবাক্ হয়ে রয়েছে তারা সতীর বোন।

নন্দিনী—মা সতীর পতি নিন্দে কে কল্যে?

জননী—বাছা, সে অনেক কথার কথা এক দণ্ডে সারবার যো নেই রাত্রিতে সব বল্‌ব।

পুত্রবধূ ননদিনীর হস্তধারন পূর্ব্বক আস্তে২ কহিল ওদিকে দেখ এক দেবতার মুখ ছাগলের মত। ঠাকুরুন্‌কে জিজ্ঞাসা কর্ না ভাই?

নন্দিনী—মা ঐ যে ও পাশে ছাগল মুখো ও কোন দেবতা?

"বাছা তুই দেখ্‌ছি আজি আমায় অন্তঃকরণ স্থির করে একবার মা দুর্গার পাদপদ্ম ধ্যান কত্তে দিলি নে। তোরা ঠাকুর দেখ আমি একবার মাদুর্গার রাঙ্গা পাদুখানি বুকের মাঝে রাখি মনের মাঝে তুলি, সমুদায় প্রতিমে খানির ছবি মনে করে নিই।" এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এই বারে গললগ্নীকৃতবাসা ও ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন "মা দুর্গে দুর্গতিহারিণি পতিতপাবনি ভবভয়ভঞ্জিনি মা মুকতুলে চেয়ো এদাসীর মনস্কামনা যেন সিদ্ধি হয়।"

"বৌমা ঠাকুর বরণ কর—গিরিবালা আঁচল দিয়া মা দুর্গার মা লক্ষ্মীর মা সরস্বতীর, কার্ত্তিক ও গণেশঠাকুরের পাদপদ্ম মুছিয়ে বৌমার আঁচলে বেধে দে।"

গৃহিণী—পুত্রবধূর প্রতি—আ আজুলীর মেয়ে কিছু জান না। আগে কি বরণের কুলো নেয়, আগে ঠাকুরের কপালে সিন্দুর দিতে হয়, হাতে পানের খিলি সন্দেশ দিতে হয়। কার্ত্তিক গণেশের চখে কাজল দিতে হয়, সকলের হাতে পান সন্দেশ দিতে হয়। তবে বরণ করে।

গিরিবালা। মা, আমি আগে বরণ করি।

জননী। না তোর আগে বরণ কত্যে নেই।

গিরিবালা। কেন মা।

জননী। বৌমা ঘরের লক্ষ্মী। আমার লক্ষ্মী আমার পুত্রের বৌ পাবে। তুই তোর শ্বাশুড়ীর লক্ষ্মী পাবি, তাই আগে তোর বরণ কত্তে মানা আছে। যার বৌ না থাকে তার লক্ষ্মী তার মেয়ে পায়। এখন তুই বরণ কর। বরণের পর হুলাহুলী ধ্বনি হইল। বাদ্যকরগণ শোকসূচক বিসর্জনের বাদ্য বাজাইল। সকলের চক্ষু পুনর্ব্বার জলে প্লাবিত হইল। চক্ষু মুছিয়া আবার প্রতিমার দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হইল।

নন্দিনী—মা বল্‌না কে ঐ ছাগল মুখো দেবতা।

জননী। উনি দক্ষরাজা। সতীর বাপ। শিবের শ্বশুর—উনি সতীর পতিনিন্দে করেছিলেন বলে সতীর শাপে ছাগল মুণ্ডু হয়ে আছেন। পতিপ্রাণা সতী কি সুন্দর কি অমায়িক পতিভক্তি দেখিয়েছেন দেখ্ দেখি। আর অতগুলি দেবকন্যে দেখ্‌ছিস সতীর রূপের কাছে ইহারা কেউ কি দাঁড়াতে পারিত, কদাচ না; কেবল পতি নিন্দা সহ্য কত্তে না পেরে কালীমূর্ত্তি হয়ে গিয়েছেন। চিত্তির কর কেমন এঁকেছে। আহা সাক্ষাৎ পতিব্রতা ধর্ম্ম যেন ঐ খেনে জাজ্বল্যমান রয়েছে।

নন্দিনী। মা দক্ষরাজা কেন জামাই নিন্দে কল্যেন!

ছাগল মুণ্ডু হোলো লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা কচ্চে না—এঃ চেয়ে যে মরণ ভাল।

জননী। দক্ষরাজ দেবতা, লোকে তাঁরে প্রজাপতি বলে। চন্দ্র তাঁর জামাই। সাতাইশটী মেয়ে ঐ দেখ একবারে চন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কশ্যপ মুনিও তার একজন জামাই। ইহার সঙ্গে তেরটী মেয়ের বিয়ে দেন। তাঁহারা সতীর পার্শ্বে বসে রোদন কচ্চেন। সতী সকল বোন্‌দের মধ্যে বয়সে ছোট। দক্ষরাজার ছোট জামাই শিব। দক্ষ মনে কল্যেন যজ্ঞ কর্ব্যেন শিবকে নেমন্‌তন্ন দেবেন না সতীকে যজ্ঞের সময় আন্‌বেন না। ত্রিসংসারে সকলের নেমন্‌তন্ন হোলো—কেবল শিব ও সতীর নেমন্‌তন্ন হলো না।

নন্দিনী—সতী ও শিবের অপরাধ কি যে নেমন্‌তন্ন হোলো না?

জননী—ঘরে খাবার নেই বলেই বাদ দেওয়া হোলো। বিশেষ জামাই পাগল ছত্রিশকোটী দেবতা ঝি বৌ নিয়ে সেজে-গুজে এসে আমোদ প্রমোদ কর্ব্যে; আপনার জামাই অমন সময় পাগলামী কল্যে পাছে মনে ক্লেশ ও রাগ হয় বোল্যে আগেই একেবারে নেমন্‌তন্ন বাদ হয়েছে।

নন্দিনী—বেশ, বিনি নেমন্‌তন্নে সতী কেন গেলেন?

জননী—কেন গেলেন তা শোন।

রোহিণী প্রভৃতি ভগিনীগণ আসিয়া কহিলেন সতী চল যজ্ঞ দেখিতে চল বিলম্ব কচ্ছো কেন। কৈ তোমার ত কোন সাজ-গোজ দেখ্‌ছিনে। সতী কহিলেন দিদী তোমাদের ভগিনী-পতিকে বাবা পাগল বলে নেমন্‌তন্ন দেন নাই। তা কেমন করে যাব তাঁর অপমান করে যেতে পারিনে। রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশ ভগিনী একবাক্যে কহিলেন বাবা ভুলে গিয়ে থাকবেন

তা নাহলে সংসারে কাকেও বল্‌তো বাকি নেই কেবল ছোট জামাইকে ভুল হবে তা কদাচ হতে পারে না। সতী কহিলেন আমরা ভিক্ষে করে খাই ছাই ভস্ম মাখি ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বেড়াই দেখে বাবার ঘৃণা হয়েছে তাই নেমন্‌তন্ন দেন নাই। দিতি, অদিতি, কদ্রু, বিনতা প্রভৃতি ভগিনীগণ আসিয়া কহিলেন তুই আমাদের ছোট বোন মা তোরে না দেখলে মনের খেদে বাঁচবেন না কত আপশোষ কর্ব্বেন। বাপমার কাছে মেয়ের আবার মান অপমান কি, গেলেই হলো—বাবা ভুলে গিয়ে থাক্‌বেন, মা জান্‌তে পেলে এমনটা হতো না। তা যা হউক পিতার যজ্ঞ দেখ্‌তে যেতে হইবে। সতী কহিলেন আচ্ছা পিতা গ্রাহ্যি করুন বা না করুন আমি মেয়ে, আমার কাজ আমি কর্ব্বো বিনি আভানে যাব। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাব না। শিবের অনুমতি নিয়ে যাব। তোমরা যাও।

সতী শিবকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া দক্ষযজ্ঞ দেখিতে যেতে অনুমতি পেলেন।

আহা কিরূপ দেখিলাম! দেখ ষাঁড়ের উপর ঐ যে ত্রিনয়নী জটাভার এলিয়ে পোড়েছে সোণার বরণ যেন পুড়ে গিয়েছে। মুখখানি বাসি পদ্মের মত শুকিয়ে গিয়েছে মনে কি ভাবিতে-ছেন।

কি আশ্চর্য্য চিত্তির করেছে। বোধ হচ্ছে যেন এ শরীরে মন প্রাণ নেই, তা যেন শিবের কাছে রেখে বাপ মার সামগ্রী অঙ্গখানি তাঁহাদিগকে দিতে যাচ্যেন। আমরি কি ভাব দিয়েছে।

দক্ষরাজের সম্মুখে যেমন সতী উপস্থিত হইয়া প্রণাম করি-লেন পোড়াকপালে বাপ অমনি বল্যেন তুই হতভাগী এখানে কেন। তুই বিধবা হ, তখন তোরে প্রতিপালন করিব। সে হতভাগা পোড়াকপালে গাঁজাখোর পাগলকে নিমন্‌তন্ন দিই

নাই তবু তোকে পাঠিয়েছে, বেটার মান অপমান কিছু বোধ নাই। সতী আর পতিনিন্দে সহ্য করিতে তা পেরে কানে আঙ্গুল দিলেন। দক্ষকে কহিলেন, পিতঃ! আমার সাক্ষাতে শিবের নিন্দে করো না। সংসারে স্ত্রীজাতির পক্ষে—এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। তথাপি দক্ষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। সতী অমনি পিতাকে শাপ দিলেন, পিতঃ! যে মুখে তুমি আমার পতি নিন্দা কল্যে যদি আমি পতিব্রতা হই তবে অবিশ্যি তোমার ও মুখের শাস্তি হইবে। তোমার মুখ যেন—এই বলিয়া সতী দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শিব সতীর দেহ পরিত্যাগ সমাচার পেয়ে দক্ষের বাড়ী এসে সতীর জন্যে অনেক খেদ কল্যেন। ভূত প্রেতগণ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে গেল। দক্ষের প্রাণবধ করিল। প্রসূতি সতীশোকে পতি-শোকে কাতর হয়ে মহাদেবের কাছে দাঁড়ালেন। স্তব স্তুতি কত্তে লাগলেন। মহাদেব প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে আবার দক্ষের প্রাণদান কল্যেন,কিন্তু পতিব্রতা সতী যা বলেছিলেন তা অন্যথা হলো না। নন্দী একটা ছাগলের মাতা বসিয়ে দিলে।

পতিব্রতা সতী সাধ্বীর নিকট তার পতিনিন্দা কল্যে কি হয় তাই সংসারের লোককে দেখাবার জন্যে দক্ষরাজ ছাগমুণ্ড নিয়েছেন। লজ্জা হয়েছে বৈ কি, কিন্তু কি করেন লোক রক্ষা কত্তে হবে ত। যে আপনি বিধি দেয় সে যদি আপনি আপনার কথার মত কাজ না করে তবে লোকে তাকে মান্‌বে কেন। দক্ষরাজা আপনি শাস্ত্র করেছেন। স্ত্রী লোকের পতিসেবা বড় ধর্ম্ম যে ব্যক্তি পতির নিন্দা করে তার মুখ দর্শন কত্তে নেই। দক্ষরাজও ভাবিলেন যেমুখে পতিব্রতা সতীঝির অন্তরে বেদনা দিইছি, সে পাপ মুখ পরিত্যাগ করাই উচিত বলে ছাগমুণ্ড নিয়ে একপ্রকার চুপচাপ করে আছেন।

নন্দিনী—তুমি যা যা বল্লে ঠিক যেন এখনি হোচ্ছে কি চমৎকার পট লিখেছে। ঐ দেখ মুনি ঋষি দেব দানব অসুর কেউ সুখী নেই সকলেরই মুখচূণ হয়ে গিয়েছে। সব ভয়ে জড়সড়। ঐ দেখ ভূত প্রেতগুলা দক্ষরাজের কি দুর্গতি করেছে। মহাদেবের মন যেন ভেঙ্গে গিয়েছে তার শরীর যেন প্রাণ শূন্যিকরে চিত্তির করেছে। আবার দক্ষরাজের যজ্ঞনাশে মহাদেবকে যেন প্রলয়-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি করে চিত্তির করেছে। বোধ হচ্ছে আধখানি অঙ্গ নেই আধখানি মূর্ত্তি একেবারে প্রলয় কালের আগুন, জটাগুলা যেন বজ্রের মত শব্দ কচ্ছে, আর যেন অনবরত বিদ্যুতের আগুন বেরুচ্ছে। পাঁচটামুখ কি ভয়ঙ্কর, বাপ! যেন সংসারটাকে একেবারে গ্রাস কর্ত্তে বসেছে। মা, সতী শিবকে বড় ভালবাসিতেন না।

জননী—বাছা, কেবল একজনের ভালবাসায় ভালবাসার আঁট বসে না। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর ভাব চাই।

নন্দিনী—সুস্বামীর ভালবাসা আগে।

জননী—তাত হবেই—মেয়েমানুষ ত স্বামীকে ভাল বাসবেই স্বামীছাড়া পৃথিবীতে স্ত্রীর আর কি ভালবাসার জিনিস আছে—দেখ দেখি মহাদেব মহামায়াকে কত ভাল বাসেন। দেখ মহাদেব মহামায়ার শরীরটে নিয়ে কি কাণ্ড কচ্যেন দেখনা এখনও ভুল্‌তে পারেন নাই। প্রণয়ের জিনিস কোন খানে রেখে ঠিক থাক্‌তে পাচ্চেন না।

শান্তিজল গ্রহণ।

চিত্রপট দর্শনে পিতৃভক্তির উদ্রেক।

এক্ষণে শুভক্ষণ শুভলগ্ন শান্তির সময় হইয়াছে সমুদায় পরিবার ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দিগকে ডাক। পুরোহিত

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদেশ অনুসারে সকলেই ৺ চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত। সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভূমিতেই উপবিষ্ট হইলেন। স্ত্রীজনেরা প্রতিমাপার্শ্বে সম্পর্ক বিবেচনায়, বয়ঃক্রম বিবেচনায় যথারীতি বৃদ্ধাগণকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া পা ঢাকিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি কোলে করে বসিলেন। পুরুষগণ ও কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক বালকগণ প্রতিমার অপরপার্শ্বে বসিলেন।

পুরোহিত ঠাকুরমহাশয় দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযুগল সংযত করিয়া ভক্তিভাবে দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিসর্জন দিতে মন যে একান্ত অনিচ্ছুক ও সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে সেই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অনবরত অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এখন সকলের মনেই কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব জন্মিয়া গেল, সকলেই হতাশ। ভাবুকমাত্রেরই হৃদয়ে শোক উপস্থিত হইল নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পতিত হইতে লাগিল।

পুরোহিত আবার সম্বৎসর পরে দেবীর আগমন প্রার্থনার মন্ত্রটী পাঠ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। এখন ভাবুকের মনে, ভক্তের মনে, স্নেহবান্ ব্যক্তির মনে প্রবোধ জন্মিল। সংসারের লোকে বুঝিল ক্ষণেক সুখ ক্ষণেক দুঃখ নিরন্তর সুখ নাই নিরন্তর দুঃখও নাই। আশা ও প্রবোধ এই দুই বস্তুদ্বারা মানবমন আবৃত আছে। নতুবা মানবমন যে প্রকার ক্ষণভঙ্গুর ইহাকে এক নৈরাশ্যই সঙ্কুর্ণ করিয়া ফেলিত।

পুরোহিত নীরাজনবিধি সমাপ্ত করিয়া শান্তিজল দ্বারা সকলের মস্তক সেচন করিলেন। তাঁহার মুখবিনির্গত শান্তি-শব্দ ও স্বস্তি শব্দগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত মানব মণ্ডলীর অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। সকলেই আহ্লাদে গদ্গদ। সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম পুরঃসর আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্ত্রীজনেরা ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

পুরোহিত ঠাকুর ছাত্রগণকে নূতন পাঠ দিবেন। শক্রোত্থানের পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য-সন্তানগণের পাঠ বন্ধ হয়। এখন যেমন কালেজের ও স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষার অবসানে ছুটীর পর আসিয়া যে পাঠ আরম্ভ করে, তাহাকে নূতন পাঠ বলিয়া ধরে, তেমনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যসন্তানগণ ভাদ্রমাসে যখন শক্রোত্থান হয় তখনি আর পাঠ করে না অবকাশ গ্রহণ করে সেই অবধি দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত নূতন পাঠ পড়ে না। বিজয়া দশমীর দিন হইতে আবার নূতন পাঠ আরম্ভ করে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাত্রগণকে রামায়ণের পাঠ দিলেন। সকলেই পুনর্ব্বার গণেশের ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়া অধ্যাপকের চরণগ্রহণ করিলেন। পরে সকলেই যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, সাদরসম্ভাষণ, আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রতিমার চিত্রপট দেখিতে লাগিলেন।

একটী ছাত্র আর একজন প্রবীণ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল দাদা ঐ যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী রামকে হাত নেড়ে যেন কি বারণ করিতেছে উনি কে, আমাকে বল না।

বয়োজ্যেষ্ঠ—উনি কৌশল্যা রামের জননী। রাম পিতাকে সত্যব্রত রাখিবার জন্য রাজ্যভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন স্বীকার করিয়াছিলেন। জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কৌশল্যা বারণ করিতেছেন। চিত্র দেখে আমার বোধ হচ্যে যেন কৌশল্যা কথা কহিতেছেন। রামকে

বনে যাইতে নিষেধ কচ্ছেন। রাম যেন উত্তর করিতেছেন পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কৌশল্যা যেন বলিতেছেন পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে সহস্র গুণ অধিক। রাম যেন কহিতেছেন পিতা আবার জননীর গুরু সেই হেতু পিতৃ আজ্ঞা মাতৃ আজ্ঞা অপেক্ষা বলবতী এইটী দেখাইতেছেন।

কৌশল্যা রামের প্রতি খেদ করিয়া কহিলেন বাছা তোর নিষ্ঠুর রাম নামের মত কাজ কল্লি। আমি আগে জান্‌লে তোর নাম রাম রাখিতে দিতেম না। রেণুকার ছেলে বাপের কথায় মায়ের মুণ্ডুচ্ছেদ করেছিলেন। তুই যদি আমার মাতা কেটে ফেল্‌তিস্ তাহল্যে আমার ততদুঃখু হতো না। বাছা দেখ দেখি আজি কোথায় রাজমাতা হব তা না কোথায় আজি পথের ভিখারিণী ও পুত্র শোক হলো এখন আমার মরণই ভাল, এই কথা বলিতে বলিতে শোকসাগর উছলিয়া উঠিল চেতনা লোপ পাইল; আমার জ্ঞান হচ্যে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমার মরণই ভাল, এই কথা বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তাই পরম দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন।

ও দিকে আর একটা ছবিতে দেখ কৌশল্যাকে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। চেতনা নাই। আহা! ঐপট খানা কেমন চিত্র করিয়াছে লক্ষ্মণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতায় সম্প্রীতি থাকেনা। দেখুক এক বার আসিয়া দেখুক রাম লক্ষ্মণে কিরূপ সৌহার্দ্য; জগতে কি এমন আছে! লক্ষ্মণের ছবিটী কেমন চমৎকার করিয়াছে। লক্ষ্মণ যেন রামকে কহিতেছেন স্ত্রীজিত পিতার এরূপ অন্যায় বাক্য কদাচ প্রতি-

পালন করিবার আবশ্যকতা নাই। পিতা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই শাস্ত্রানুসারে এরূপ ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালনের আবশ্যকতাই নাই। বরং তাহার ঐ রোগশান্তির চেষ্টা করা উচিত।

ওদিকের আর একখানা পট দেখ। রাম যেন লক্ষ্মণকে কহিতেছেন ভাই আমি তোমার শাস্ত্র মানিলাম কিন্তু আমার মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব। পিতা যখন বিমাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন যদি এখন তিনি না দেন তবে সত্যচ্যুত হইবেন। সংসারে পিতাই সাক্ষাৎ দেবতা। তিনিই এদেহ মন ও আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। পুত্রগণ পিতার ছায়ামাত্র; তিনি মিথ্যাবাদী হইলে আমরাও মিথ্যাবাদী হইব। জগতে আমাদিগকে পামর বলিবে। বিশেষতঃ আমি বিমাতার মনে, পিতার মনে, জগতের লোকের মনে খেদ রাখিতে ইচ্ছা করি না। সত্যই পরম ধর্ম্ম আমিও পিতার নিকট ত্রিসত্য করিয়াছি বনে যাইব।

আর একদিকে আর একখানা পট দেখ। রাম ও লক্ষ্মণ মুনিবেশে সীতাসমভিব্যাহারে বনে যাইতেছেন। ভরত রামের চরণ ধারণপূর্ব্বক কি কহিতেছেন বুঝিয়াছ?

কনিষ্ঠ ছাত্র—না,—

জ্যেষ্ঠ—রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া রামলক্ষ্মণ সীতাদেবীর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পতিত হইতেছে। ঐ দেখ ভরত কত অনুনয় বিনয়বাক্যে রামকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রামের মুখ দেখে বোধ হচ্যে রাম কদাচ চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে রাজ্যগ্রহণ করিবেন না—ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন। ভরত জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া রাজ্যভার গ্রহণে স্বীকৃত নন।

তিনি রামের পাদুকাকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন। আহা কি পরমাশ্চর্য্য রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দেখ আকৃতি দেখিলে নিশ্চয় বিবেচনা হইবে পৃথিবীতে যদি কেহ জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুজের ভক্তি দেখাইবার প্রমাণস্থল চাহে তবে লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি দেখুক সাক্ষাৎ জ্যেষ্ঠভক্তির অবতার দেখিতে পাইবে।

যাহারা পৈতৃক বিভব লইয়া সহোদরের সঙ্গে বিবাদ করে তাহারা দেখুক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সঙ্গে কত সম্প্রীতি, ভরত ও রাম পরস্পর রাজ্যলোভ বিষয়ে কেমন নিস্পৃহ। পরস্পরের প্রতি কেমন অচলা ভক্তি অমায়িক স্নেহ।

ঐ দেখ পুরু স্বীয় পিতা যযাতিকে আপনার যৌবন প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়াছেন। পিতৃভক্তি নিদর্শন ঐখানে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অন্য পুত্রগুলি যাহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন করে নাই তাহারাও ঐ খানে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু কি চমৎকার ব্যাপার উহাদিগকে দেখিতে ঘৃণা বোধ হইতেছে। পুরুর জরাদেহকে পরম পবিত্র ও জাজ্বল্যমান ধর্ম্মের অবতার বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। জগতের কেহ যদি পিতৃভক্তির আদর্শ রাখিতে ইচ্ছা করে তবে পুরুর আকৃতি মানসপটে চিত্র করিয়া রাখুক।

পুরু সহস্র বৎসর জরা ভোগ করিবেন এত বড় কঠিন ব্যাপারে পুরুর অন্তঃকরণ কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এমন কি সুদৃঢ় ছবি খানি দেখিলে মনের মধ্যে কত অপূর্ব্ব ভাবই উদয় হয়। দেখ ভাই যতপ্রকার দুঃখ আছে জরা তার অপেক্ষা দুঃখ সংসারে দ্বিতীয় নাই। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীবন্মৃতের তুল্য। পুরু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতাদৃশ সুদীর্ঘ কাল মধ্যে এক দিনের জন্যও পিতার প্রতি

বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্রহ্মাণ্ডের লোককে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য পিতৃভক্তি স্বয়ং শরীরী হইয়া পুরুরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

শরৎশশী।

(১)

শরতে সোনার শশী কি সুন্দর শোভেরে!
হাসিছে গগনোপরে, পুলকে প্রেমের ভরে,
পূর্ণশশী সুধারাশি হাসি মনোলোভে রে।
সুনীল বিমল নভঃ, ক্ষীণজ্যোতি তারা সব,
শশী-প্রেমালোকে তারা লুকাইছে এবে রে,
শরতে সোনার শশী কি সুন্দর শোভে রে!

(২)

তোমারে শরৎশশী, আমি বড় ভাল বাসি
প্রেমানন্দ-নীরে ভাসি যখনই নেহারি,
কিবা তব রূপরাশি অনম্বর বিহারী!
নিবাইয়া তারকারে, ভাসাইছ প্রেমাসারে,
তোমার গগনদেবে রূপরাজি প্রসারি,
কত শত শুক্ল মেঘ শোভিছে সারি সারি!

(৩)

মরি কি মধুর হাসি হাসিছ গগনে রে,
রজনী হৃদয়ে ধরি, হাসিছ বদন ভরি,
হাসাইছ গিরিবন, ত্রিজগত জনে রে;
প্রতিদিন নানা দেশে, যামিনারে বধূবেশে,

দেখাইছ অহঙ্কারে প্রফুল্ল আননে রে,
কাঁদিতে হইবে শেষে হাসিছ এখনে রে।

(৪)

আবার প্রাবৃট্-কালে, নবীন নীরদ জালে
মধুর কাঞ্চন কান্তি বপু তব ছাইবে,
প্রচণ্ড পবন শ্বাস অবিরত ধাইবে,
দিন দিন পল পল, ঝরিবে জলদ জল,
যামিনী তোমার আর দেখা নাহি পাইবে।
এদশা তোমার কিন্তু কিছুদিনে যাইবে।

(৫)

আমার এদশা সখে! চিরকাল রহিবে,
অনন্ত জীবন বুঝি এ পরাণ দহিবে;
কাঁদিতেছি অবিরল, ফুরাবেনা অশ্রুজল
দুরন্ত যন্ত্রণা মোর অন্ত কভু নহিবে,
ধরি এ জীবন কাল এ বরষা বহিবে।
শুনিয়াছি এ হৃদয়, কভু সুখ দুঃখ নয়,
এজগতে চিরদিন কিছুই না রহিবে
কেবল আমারি চিত্ত চিরদুঃখ সহিবে।

(৬)

আর কি বরষা গিয়ে শরৎ আসিবেরে?
আমার হৃদয় শশী,হাসিয়া মধুর হাসি
আমার হৃদয়াকাশে আবার ভাসিবে রে!
প্রসারি সুস্নিগ্ধ কর উদিবে গগনোপর?
হাস্‌রে প্রেমের হাসি বড় ভাল বাসিরে
শরতে সোনার শশী! কি মধুর হাসিরে!

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ